আত্মনির্মাণ

মহাজাতক



আত্মনির্মাণ

মহাজাতক

SUVOM

প্রজাপতি প্রকাশন

প্রকাশক
কাজী শাহনূর হোসেন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
গ্রন্থস্বত্ব: লেখকের
প্রথম প্রকাশ:
১৯৯৮
প্রচ্ছদ
আলীম আজিজ
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
যোগাযোগ
প্রজাপতি প্রকাশন
[সেবা প্রকাশনীর অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান]
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
e-mail: sebaprok@citechco.net
Website: www.Boi-Mela.com
পরিবেশক
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

ATMONIRMAN
By: Mahajataq
ISBN-984-462-924-1
মূল্য: একশত পনেরো টাকা

মহাজাগতিক সফরসঙ্গী
নাহার-কে

আত্মনির্মাণের পথেই মানুষ তার মেধাকে বিকশিত করে, পরিণত হয় অনন্য মানুষে। আত্মনির্মাণ নিঃসন্দেহে বড় মাপের ব্যাপার। আর যে-কোন বড় নির্মাণ বা স্থাপনার ভিত্তি হচ্ছে ছোট-ছোট ইট। আপনার জীবন গড়ার কিছু ছোট-ছোট ইটকেই সাজিয়ে আপনার হাতে তুলে দেয়া হয়েছে এই 'আত্মনির্মান'-এ।

সূচী

ভ্রান্ত বিশ্বাসের বন্দী

হস্তিশিশু আদরিণী। মায়ের সাথে বনবাদাড় ভেঙে চষে বেড়ায় মুক্তির আনন্দে। এ আনন্দে ছেদ পড়ল একদিন। শিকারিদের হাতে ধরা পড়ল সে। পায়ে শক্ত শিকল পরিয়ে বিক্রি করে দেয়া হলো সার্কাস পার্টির কাছে। সার্কাসের পশুপালক তাকে ছ'ফুট লম্বা লোহার শিকল দিয়ে বিরাট থামের সাথে বেঁধে রাখল।

বনের মুক্ত প্রাণী আদরিণী বন্দী হয়ে গেল ছ'ফুট ব্যাসার্ধের বৃত্তের মাঝে। কিশোরী আদরিণীর কাছে এ এক অসহ্য যন্ত্রণা। বারবার জোরে টান মেরে শিকল ছিঁড়ে ফেলতে চেষ্টা করতে থাকে। চেষ্টায় লাভ হয় না কিছুই। শুধু পা রক্তাক্ত হয়ে উঠে। ব্যথা ও যন্ত্রণায় কাতরাতে হয়। রক্তাক্ত পায়ে টান পড়লে ব্যথা আরও বাড়ে। শিকল ছেঁড়ে না। মুক্তিও মেলে না। আস্তে আস্তে তার বিশ্বাস জন্মাতে লাগল, এ শিকল ভাঙা যাবে না। ভাঙতে গেলে ব্যর্থতাই আসবে, ব্যথাই বাড়বে।

আদরিণী বড় হতে লাগল। কিন্তু শিকল সে ভাঙতে পারল না। আস্তে আস্তে তার মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও মন থেকে বিলীন হয়ে গেল। তার পৃথিবী সীমিত হয়ে গেল ছ'ফুট শিকলের বৃত্তের মাঝে। পায়ে একটু টান পড়লেই বোঝে তার সীমানা শেষ। এতেই সে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। এখন আর শিকল বাঁধার জন্যে মোটা শক্ত কাঠের গুঁড়ির প্রয়োজন হয় না। ছাগল বাঁধার ছোট খুঁটি হলেই চলে। পরিণত বয়সে বিশাল দেহ ও বিপুল শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আদরিণী তার দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠা ধারণার নিগড়েই আটকে থাকল। এক ঝটকায় খুঁটি থেকে নিজেকে মুক্ত করার শারীরিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও তার মনে বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে যে এই ছ'ফুট ব্যাসার্ধের বৃত্তই তার পৃথিবী। এটাই তার বিধি। এটাই তার নিয়তি। যখনই তার পায়ে একটু টান লাগে তখনই সে ধরে নেয় এর বাইরে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। সার্কাস দলের সাথে সে নানা জায়গায় যায়। শেখানো খেলা দেখায়। একটি ছোট খুঁটিতেই এখন তাকে বেঁধে রাখা হয়।

সার্কাসের তাঁবুতে আগুন লাগল একদিন। সার্কাসের লোকজন যার যার জীবন নিয়ে পালাল। আগুন নেভানোর পর দেখা গেল অনেক কিছুর সাথে আদরিণীও পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। পায়ের সেই শিকল রয়েছে। খুঁটি পুড়ে গেছে। পর্যাপ্ত শারীরিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও ভ্রান্ত বিশ্বাসের বন্দী আদরিণী মুক্ত হওয়ার কোন চেষ্টাই করেনি।

আদরিণীর এই কাহিনী কোন বানানো গল্প নয়। যাঁরা সার্কাসের দল দেখেছেন, তাঁরা খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন সার্কাসের বিশালকায় হাতিগুলোকে এভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সার্কাসের বহু হাতি এভাবেই মারা গেছে অগ্নিকাণ্ডে।

হতভাগিনী এই হাতির মতই ভ্রান্ত বিশ্বাসের বন্দী নরনারীর সংখ্যা আমাদের সমাজে মোটেও কম নয়। কত ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাস যে আমাদের মাঝে রয়েছে তা বলে শেষ করা যাবে না। যেমন: আমার পোড়া কপাল···, এত দায়িত্ব পালনের যোগ্য আমি নই···, সে ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশুনো করেছে, তার সাথে প্রতিযোগিতায় আমি পারব না···, এই পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো মুশকিল···, জীবনটা আমার দুঃখে-দুঃখেই যাবে···, বড় কিছু করা আমার কপালে নেই···, আমার কপালে সুখ সয় না···, আমার এই অসুখ ভাল হবে না···এরকম হাজারও নেতিবাচক ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের নিগড়ে আমরা বন্দী জীবন যাপন করছি।

বিশ্বাস ভ্রান্ত হোক বা সঠিক হোক, তার একটি সম্মোহনী ক্ষমতা রয়েছে। ডা.

ম্যাক্সওয়েল মলজ বিশ্বাসকে এক ধরনের আত্মসম্মোহন বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রতিটি মানুষই কোন না কোনভাবে কিছুটা হলেও সম্মোহিত হয়ে থাকে। সে কখনও নিজের অজ্ঞাতসারে অন্যের ধারণা গ্রহণ করে সম্মোহিত হয়, বা নিজের সম্পর্কে বারবার কোন ধারণা ব্যক্ত করে তা বিশ্বাস করে সম্মোহিত হয়। একজন সম্মোহনকারী সম্মোহিত ব্যক্তির মনে কোন নেতিবাচক ধারণা ঢুকিয়ে দিলে যে প্রভাব সৃষ্টি করবে ঠিক সেই একই ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করে থাকে এই নেতিবাচক বিশ্বাস বা ধারণা। আমরা জানি, সম্মোহিত অবস্থা হচ্ছে মনোযোগ প্রক্ষেপণের ফলে সৃষ্ট সংকীর্ণ পরিধিতে চেতনার এক তুঙ্গ অবস্থা। চেতনার এই পরিধিতে মস্তিষ্কের ডান বলয়ের চিত্রকল্প সুস্পষ্ট প্রক্ষেপণের ক্ষমতা ব্যবহৃত হয় এবং এ ক্ষমতা বাম বলয়ের সকল প্রতিবন্ধকতা, অর্থাৎ যুক্তিগত বাধাকে পাশে সরিয়ে দেয়। আর আপনারা সবাই জানেন, সম্মোহিত অবস্থায় একজন মানুষ যে অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করে তা তার মাঝে আগে থেকেই সুপ্ত ছিল। কিন্তু সে এ ব্যাপারে সচেতন ছিল না বলে আগে এ ক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারেনি। যারা ভ্রান্ত বিশ্বাসের বন্দী তারা সব সময় নিজের অজ্ঞাতসারেই নিজের শক্তি ও ক্ষমতাকে সীমিত করে ফেলে নিজের মধ্যে সুপ্ত অফুরন্ত সম্ভাবনা সম্পর্কে বেখবর থেকে যায়। পারিপার্শ্বিক ব্যর্থতা ও নির্জীবতায় আক্রান্ত হয়।

ভ্রান্ত বিশ্বাসের বন্দীত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে ডক্টর ম্যাক্সওয়েল মলজের সাইকোকেবারনিটিক্স পদ্ধতিতে বেশ সহজ কিছু উপায় বাতলানো হয়েছে। আপনি অনায়াসে এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে পারেন।

ভ্রান্ত বিশ্বাস চিহ্নিত করার উপায়

আপনি কি কোন ভ্রান্ত বিশ্বাসের বন্দী হয়ে আছেন? খুব সহজেই তা খুঁজে বের করতে পারেন। হাতে কাগজ-কলম নিন। নিচের প্রশ্নগুলো পড়ুন এবং জবাব লিখুন।

১. বাস্তবে আপনার প্রতি হুমকি নয় এমন কোন পরিস্থিতিতেও কি আপনি ভীত-সন্ত্রস্ত বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন? এই পরিস্থিতিগুলো কী কী? অচেনা লোককে টেলিফোন করা? মিস্ত্রির সাথে মেরামতি কাজের বিল নিয়ে আলোচনা বা পদস্থ কারও সাথে সাক্ষাৎ করা? কেন আপনি মনে করেন যে এ ধরনের পরিস্থিতি আপনার শরীর-মনের জন্যে ক্ষতিকর?

২. আপনি কি মনে করেন যে, আপনা-আপনিই এমন সব ঘটনা ঘটে যা আপনার সাফল্যের পথে অন্তরায়? আপনি কী পাওয়ার জন্যে চেষ্টা করছেন? সুনির্দিষ্ট কী পরিস্থিতি আপনার জন্যে বাধা সৃষ্টি করছে? নিম্নোক্তভাবে আপনার জবাব লিখুন: আমি···হতাম, যদি না···ঘটনা অন্তরায় সৃষ্টি করত।

৩. লক্ষ্য অর্জন করতে গিয়ে আপনার কি কখনও মনে হয়েছে যে, 'আমি পারব না,' 'আমি ভাল নই,' 'আমি যোগ্য নই,' 'আমি এর উপযুক্ত নই···? এ ধরনের চিন্তা কী পরিস্থিতিতে সৃষ্টি হয়েছে? আপনি নিজেকে কী বলেছেন? আপনার লক্ষ্য কী ছিল? নিজের উত্তর এভাবে লিখুন: আমি মনে করি যে···আমি পারব না, কারণ···।

৪. আপনার কি কখনও মনে হয়েছে যে, আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছার পথে এক ধরনের দীর্ঘসূত্রিতায় আটকে যাচ্ছেন? এক ধরনের অপবাদে জড়িয়ে পড়ছেন? কী চেয়েছিলেন আপনি? পেশা বা চাকুরি পরিবর্তন? সম্পর্ক উন্নয়ন? ব্যক্তিগত কোন উদ্যোগ? কী অনুভূতির পরিপ্রেক্ষিতে আপনি পরিকল্পনা করেছেন? সুনির্দিষ্টভাবে লিখুন।

সব লেখা শেষ করেছেন? আপনার ব্যর্থতার জন্যে যে কারণগুলো বের করেছেন সেগুলো ভালভাবে দেখুন। ভয়, সংশয় বা আত্মধিক্কার—যাই আপনি বর্ণনা করেছেন তার সবটাই ভ্রান্ত বিশ্বাসে নিজের অজ্ঞাতে সম্মোহিত হওয়ারই পরিণাম। অবচেতন মনের কাছে বারবার একই পুরানো ভাঙা রেকর্ড বাজানোর ফলশ্রুতি।

আপনি এখনও এ কথাগুলো হয়তো মানতে পারছেন না। আপনি এখনও হয়তো বলছেন, এ ধারণা বা বিশ্বাসগুলো তো মিথ্যা নয়। আমি তো অপমানিত হয়েছি! আমি তো এ কাজের যোগ্য নই! অন্যকে আকৃষ্ট করার কোন গুণাবলী তো আমার নেই!

যদি তাই হয় তবে আপনাকে আরও গভীরে যেতে হবে। খুঁজে বের করতে হবে আপনার ভ্রান্ত বিশ্বাসের উৎস। কাগজ-কলম নিন। নিচের প্রশ্নগুলোর জবাব লিখুন:

১. বুঝতে শেখার পর আপনার প্রথম স্মৃতি কী?
—ঘটনাটি কী ছিল?
—বয়স কত ছিল?
—আপনার সাথে কে ছিল?
—কী অনুভূতি মনে পড়ছে?

২. ছোট শিশু হিসেবে আপনি কেমন ছিলেন?
—আপনার ব্যাপারে পরিবারে কোন্ গল্প প্রচলিত?
—আপনি কি মনে করেন যে আপনি পরিবারের কাঙ্ক্ষিত সন্তান?
□ হ্যাঁ □ না
আপনার এই ধারণার সমর্থনে কোন্ ঘটনা কাজ করছে?
—আপনার ডাক নাম কী?
—আপনি কি পরিবারের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন?
□ হ্যাঁ □ না
উত্তর যদি 'না' হয় তবে এর সমর্থনে কোন ঘটনা রয়েছে কি?
—স্কুলে পড়াশোনা শুরু করার আগের সময়কে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

৩. প্রাইমারি স্কুলে আপনার জীবন কেমন ছিল?
—কোন্ কোন্ ঘটনা আপনার বেশ মনে আছে?
—আপনার শিক্ষকরা আপনার সম্পর্কে কী বলতেন?
—আপনার প্রগ্রেস রিপোর্টে সাধারণভাবে কী লেখা হত?
—ছোটবেলায় বন্ধুত্ব কতটুকু করতে পারতেন?
□ খুব সহজে □ কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল □ তেমন কোন বন্ধু ছিল না
—আপনার সহপাঠীদের আপনার সম্পর্কে কেমন ধারণা ছিল?
□ ভাল □ বেশ ভাল
□ সাদামাঠা

এই উত্তরগুলোর সাথে আগের প্রশ্নের উত্তরগুলো মিলিয়ে দেখুন। আপনার ভ্রান্ত বিশ্বাসের উৎসগুলো খুঁজে পাবেন।

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, স্কুলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত শিশুর নিজের সম্পর্কে ধারণা জন্মে পারিবারিক পরিমণ্ডলে তার সম্পর্কিত কথাবার্তা ও আলাপ-গল্প থেকে। স্কুলে যাওয়ার পর বাইরের প্রভাব ঘরে অর্জিত নিজ সম্পর্কিত যোগ্যতা বা অযোগ্যতার ধারণাকে জোরদার করে।

ছোটবেলার স্মৃতিই আপনার ভ্রান্ত বিশ্বাসের উৎস খুঁজে বের করতে সক্ষম।

বাবা/মা/ভাই/বোন বা আত্মীয়দের আপনার সম্পর্কিত নেতিবাচক কথার ক্রমাগত প্রভাবই আপনার অসীম শক্তিকে সীমিত করে ফেলে। নিজের অসীম শক্তি আপনার অগোচরেই বন্দী হয়ে পড়ে।

এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের বন্দীত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কী? উপায় খুবই সহজ। আপনি জানেন আপনার এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের কোন যৌক্তিক ভিত্তি নেই। কিছু অযৌক্তিক নেতিবাচক কথার বারবার পুনরাবৃত্তি আপনার আসল শক্তিকে শৃঙ্খলিত করে ফেলেছে। আর আপনার এই ভ্রান্ত বিশ্বাস এখন আপনার দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তবে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, যে কোন অভ্যাস বদলানো যায়। একটু সচেতন প্রচেষ্টা চালালেই এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের বন্দীদশা থেকে আপনি মুক্তি পেতে পারেন। কারণ মানুষ হিসেবে আপনি অনন্য। পৃথিবীর ৫০০ কোটি মানুষের কেউই আপনার মত নয়। সবার মত আপনিও অনন্য কিছু গুণাবলী নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। এই গুণাবলীকে আপনিও বিকশিত করতে পারেন। কারণ সভ্যতার সব কিছু মানুষের সৃষ্টি। আর আপনিও মানুষ।

কোয়ান্টাম মেথড অনুসারে আপনি নেতিবাচক চিন্তা ও কথা তথা ভ্রান্ত বিশ্বাসের বন্দীত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে শিথিলায়ন প্রক্রিয়ায় আলফা স্টেশনের ওয়েটিং রুমে বসে সকল নেতিবাচক চিন্তা ও ধারণাকে এক এক করে লিখে তা ক্রস চিহ্ন দিয়ে বাতিল করে দিন। বাস্তবে কোন নেতিবাচক চিন্তা এলে সাথে সাথে 'তওবা, তওবা' বা 'বাতিল, বাতিল' বলে তার প্রভাব নষ্ট করে দিন। আর মনের বাড়িতে বসে সব সময় আত্মশক্তি জাগ্রত হওয়ার অটোসাজেশন দিন বা বারবার ইতিবাচক প্রত্যয়ন করুন। আত্মপ্রত্যয়নের পুনরাবৃত্তি করুন। দেখবেন ভ্রান্ত বিশ্বাসের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেয়ে অসীম সম্ভাবনার আকাশে আপন মহিমায় বিচরণ করছেন আপনি।

আগে জানুন আপনি কেন বাঁচবেন

জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে হলে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য জানা প্রয়োজন। আপনি যদি আপনার বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করতে পারেন তাহলে পারিপার্শ্বিক অনেক কিছুর অবাঞ্ছিত প্রভাব থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবেন। কিন্তু যদি সরাসরি কাউকে প্রশ্ন করা হয় যে, আপনার জীবনের লক্ষ্য কী, তাহলে দেখা যাবে যে শতকরা ৯৫ জনই আমতা-আমতা করছেন। কিছুই বলতে পারছেন না। অথচ জীবনের কাছ থেকে আপনি কী চান তা যদি আপনার কাছে সুস্পষ্ট না থাকে তাহলে জীবন আপনাকে কোথাও নিয়ে পৌঁছাবে না। আপনি হাল ছাড়া নৌকার মত জীবনসাগরে শুধু ঘুরপাক খাবেন।

আপনি যদি ইতিমধ্যেই জীবনের লক্ষ্যস্থির করে না থাকেন তা হলে এখনই উদ্যোগ নিন। নিরিবিলি জায়গায় একটি টেবিলের সামনে কাগজ-কলম নিয়ে শান্ত হয়ে বসুন। হালকাভাবে চোখ বন্ধ করুন। ধীরে ধীরে লম্বা দম নিন। ধীরে ধীরে দম ছাড়ুন। ৫/৭ বার এভাবে দম নিন ও দম ছাড়ুন। এরপর এক মিনিটের মত দম খেয়াল করুন। অর্থাৎ, চোখ বন্ধ রেখেই নাক দিয়ে কিভাবে বাতাস ফুসফুসে যাচ্ছে ও বেরিয়ে আসছে সেদিকে মনোযোগ দিন। এতে দেখবেন আপনার মনে এক প্রশান্ত ভাব চলে আসছে। আপনার মানসিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পর নিজেকে প্রশ্ন করুন:

১. কী করতে আমার সবচেয়ে ভাল লাগে?
২. আমি কী করতে চাই?
৩. কখন আমার নিজের জীবনকে সবচেয়ে অর্থপূর্ণ মনে হয়েছিল?
৪. আমার জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য কী?
৫. কী আমাকে সবচেয়ে বেশি আনন্দ দেয়?

প্রতিটি প্রশ্নকে মনের গভীরে ছেড়ে দিন। একই ধরনের আরও বহু প্রশ্ন এসে ভিড় করতে পারে। যত প্রশ্ন আসে আসতে দিন। মনের গভীর থেকে উত্তর আসার সুযোগ দিন। যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন নেই। অনুভূতিগুলোকে প্রাধান্য পেতে দিন। উত্তর যাই আসতে থাকুক, চোখ মেলে লিখে ফেলুন। অনেক চাওয়া, অনেক কথা হুড়মুড় করেও চলে আসতে পারে। আসুক। কথাগুলোকে লিখে ফেলুন। প্রথম অবস্থায় যে কথাগুলো আসবে এর বেশির ভাগই সম্ভবত সচেতন মনের আকাঙ্ক্ষা। লেখা শেষ হলে আবার চোখ বন্ধ করে উত্তর অন্বেষণ করুন। আস্তে আস্তে মনের আরও গভীরে প্রবেশ করুন। জবাব পেয়ে যাবেন। এক বসায় বা এক দিনে জবাব নাও আসতে পারে। প্রয়োজনে একাধিকবার বসুন। জবাব আপনি পাবেনই।

প্রশ্নগুলোর জবাব পাওয়ার পর আবার নিজেকে প্রশ্ন করুন:

১. আমার এই চাওয়াগুলোকে বাস্তবায়িত করার পথে অন্তরায় কী?
২. কেন আমার চাওয়া বাস্তবায়িত হচ্ছে না?
৩. চাওয়াগুলোকে বাস্তবায়িত করার পথে পারিপার্শ্বিক বাধাগুলো কী?
৪. চাওয়াগুলোকে বাস্তবায়িত করার পথে আমার নিজের দিক থেকে কী কী বাধা কাজ করছে?

প্রশ্নগুলোর জবাব পাওয়ার জন্যে নিজেকে সময় দিন। আত্মনিমগ্ন থাকুন। মনের গভীর থেকে জবাবগুলো আসতে দিন। জবাব এলে চোখ মেলে তা সামনে

রাখা কাগজে লিখে ফেলুন।

আবার চোখ বন্ধ করুন। নিজেকে প্রশ্ন করুন:

১. চাওয়াকে পাওয়ায় রূপান্তরিত করার জন্যে আমার নিজের মধ্যে কী কী পরিবর্তন আনা প্রয়োজন?

২. নিজের জীবনের উদ্দেশ্যকে, নিজেকে প্রকাশ করার জন্যে আমি কী কী পদক্ষেপ নিতে পারি?

প্রশ্নগুলোর জবাব পাওয়ার জন্যে নিজেকে সময় দিন। আত্মনিমগ্ন থাকুন। মনের গভীর থেকে জবাবগুলো আসতে দিন। জবাব পাওয়ার পর জবাবগুলো সামনে রাখা কাগজে লিখে ফেলুন।

আবার চোখ বন্ধ করুন। কয়েকবার ধীরে ধীরে দম নিন। ধীরে ধীরে দম ছাড়ুন। নিজের মাঝেই ডুবে যান। নিজেকে প্রশ্ন করুন:

১. এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে আমার আশু করণীয় কী?

জবাব আসতে সময় দিন। জবাব আসার সাথে সাথে চোখ খুলে তা এক এক করে লিখে ফেলুন। আর করণীয় কাজগুলো এক এক করে শুরু করুন। একটি একটি করে পদক্ষেপ নিন। যত ছোট পদক্ষেপই হোক না কেন, শুরু করুন। কারণ হাজার মাইলের অভিযাত্রাও শুরু হয় একটি ছোট পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে। দীর্ঘসূত্রতা ও আলস্যকে প্রশ্রয় দেবেন না। সময় নষ্ট করবেন না। সময়মত পদক্ষেপ নিলেই আপনি লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবেন।

ভাল আছি! ভাল থাকুন!

সফলতা হচ্ছে এক বিরামহীন সফর। সফলতা গন্তব্য নয়। সফলতা গন্তব্যে পৌঁছানোর একটি পথ। আর গন্তব্যে পৌঁছার জন্যে পথ পরিবর্তনেরও প্রয়োজন হতে পারে। আপাত দৃষ্টিতে ব্যর্থতাও পরিপূর্ণ সফল জীবনের জন্যে মাইলফলক হিসেবে কাজ করতে পারে। আত্ম-উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ ডেনিস ওয়েটলি একটি চমৎকার ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি ১৯৭৯ সালের। ডেনিস ওয়েটলি শিকাগো থেকে লস অ্যাঞ্জেলসে যাবেন। সেখানে তার বক্তৃতা দেয়ার কথা। ব্যস্ততাকে সামাল দিয়ে শিকাগোর ওহারা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে পৌঁছে দেখেন দেরি হয়ে গেছে। দৌড়ে টার্মিনালে পৌঁছে দেখেন গেট বন্ধ হয়ে গেছে। বিমানে ওঠার সিঁড়ি সরিয়ে ফেলা হচ্ছে। গেট কীপার মহিলাকে তিনি বিমানটি থামানোর জন্যে অনুনয়, অনুরোধ, তর্ক বিতর্ক করলেন। কোন লাভ হলো না। চোখের সামনে বিমানটিকে রানওয়ে দিয়ে চলে যেতে দেখলেন।

রাগে ক্ষোভে ঝড়ের বেগে তিনি ফিরে এলেন টিকেট কাউন্টারে। আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানাবেন। তিনি লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন। এ সময় বিকট বিস্ফোরণের শব্দ হলো। তিনি লাইনে দাঁড়ানো অবস্থায়ই জানতে পারলেন, যে বিমানে তার যাওয়ার কথা ছিল, তা আকাশে উঠার সাথে সাথে বিধ্বস্ত হয়েছে। বিমানের একটি ইঞ্জিন ভেঙে রানওয়েতে পড়ে যায়। হাইড্রোলিক লাইন ও কন্ট্রোল কেবল ছিঁড়ে যায়। পাইলট বিমানটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়। বিমানের আরোহী ও ক্রু সবাই নিহত হয়।

ডেনিস ওয়েটলি এই ঘটনার সুদূর প্রসারী প্রভাব সম্পর্কে লিখেছেন, 'আমি টিকিট লাইন ত্যাগ করে এয়ারপোর্ট হোটেলে একটা রুমে উঠলাম। বিছানার পাশে কার্পেটের ওপর নতজানু হয়ে সেজদা করলাম। স্রষ্টার কাছে শুকরিয়া আদায় করে প্রার্থনা করলাম। এক যুগ পার হয়ে গেছে। এখনও ফ্লাইট ১৯১-এর টিকিটটি আমার কাছে রয়েছে। আমি কখনও টাকা ফেরত নেয়ার জন্যে টিকিটটি ট্রাভেল এজেন্টের কাছে পাঠাইনি। আমি এই টিকিটটি আমার অফিস কক্ষে বুলেটিন বোর্ডে আটকে রেখেছি। এই টিকিটটি নীরবে স্মরণ করিয়ে দেয় প্রতিদিনই আমার জন্যে ক্রিসমাস। আমি বেঁচে আছি এটাই তো অনেক বড় রহমত।'

পরিপূর্ণ জীবনের জন্যে

১. মানুষকে গুরুত্ব দিন: কোনটা প্রয়োজনীয় আর কি করা ভাল তা বুদ্ধিমত্তার সাথে বিবেচনা করুন। অনেকেই আছেন যারা মূলত নিঃসঙ্গ ও ক্লান্তিকর জীবন যাপন করেন। কারণ তাঁরা ব্যক্তিগত সম্পর্কে অবহেলা করেছেন। অধিকাংশ সময়ই তারা কাজ বা পেশাকে এত বেশি গুরুত্ব দেন যে, বন্ধু ও পরিবার পুরোপুরি বঞ্চিত হয়। খ্যাতি বা অর্থের পেছনে এঁরা এতটা অন্ধের মত ছোটেন যে স্ত্রী-সন্তান, বাবা-মা কাউকেই কোন সময় দিতে পারেন না। ফলে পরবর্তী সময়ে অর্থ ও খ্যাতির মাঝেও একেবারে নিঃসঙ্গ ও বঞ্চিত অবস্থায় পড়ে যান তখন তিনি সন্তান বা স্ত্রীর সময় কামনা করেন। কিন্তু দেখা যায় যে, স্ত্রী বা সন্তানের তাকে দেয়ার মত সময় নেই। তারা তাদের নিজস্ব জগৎ গড়ে তুলেছে। তাই পরিবারের জন্যে, বন্ধুদের জন্যে, আত্মীয়দের জন্যে, সামাজিক কাজের জন্যে আগে থেকেই সময় বের করে

নিন। আন্তরিক বন্ধন গড়ে তুলতে সময় ব্যয় করুন। ক্লান্তিকর জীবন থেকে আপনি মুক্তি পাবেন।

২. সবার সাথে সহানুভূতিপূর্ণ ও সম্মানজনক আচরণ করুন: অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা বা অবহেলাপূর্ণ আচরণ সব সময় জীবনকে মমতাহীন পাশবিকতার দিকে নিয়ে যায়। অপর পক্ষে বিনয়, সহানুভূতি ও মর্যাদাপূর্ণ আচরণ জীবনকে মহিমান্বিত করে। মর্যাদাপূর্ণ ও শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ শুধু বন্ধুদের সাথে নয়, শত্রুদের সাথেও করা যেতে পারে। শত্রুর সাথে সহানুভূতি ও মহানুভব আচরণ অনেক সময় শত্রুতা দূর করতেও সাহায্য করে। আমরা যদি বাংলার বীর ঈশা খাঁর জীবন দেখি, তবে এর জ্বলন্ত প্রমাণ পাই। বিশাল মোঘল বাহিনী যখন ঈশা খাঁর রাজধানী সোনার গাঁ আক্রমণ করল, তখন ঈশা খাঁ মোঘল সেনাপতি মানসিংহকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারণের আহ্বান জানালেন। রাজা মানসিংহ আহ্বানে সাড়া দিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে মানসিংহের তরবারি ভেঙে গেল। ঈশা খাঁ অনায়াসে এই সুযোগ গ্রহণ করে মানসিংহকে বধ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে নতুন তারবারি এগিয়ে দিয়ে পুনরায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বান জানালেন। ঈশা খাঁর মহানুভবতা মানসিংহের হৃদয় জয় করল। দুই পক্ষের সন্ধি হলো। মানসিংহ দিল্লী ফিরে গেলেন। মহানুভবতা প্রদর্শন না করে ঈশা খাঁ মানসিংহকে হত্যা করতে পারতেন। পরিণামে দিল্লী থেকে আরও বিশাল বাহিনী আসত। যার মোকাবিলা হয়তো ঈশা খাঁর পক্ষে করা সম্ভব হত না। কিন্তু ঈশা খাঁর মহানুভবতা তাঁকে রক্তক্ষয় ও ভবিষ্যৎ পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। আসলে সহানুভূতি ও মহানুভবতা এমন এক মানবীয় গুণ যা জীবনকে স্বর্গীয় করে তোলে।

৩. সবসময় শোকর গুজার থাকুন: দুঃখ কষ্টের দিকে সহজেই আমাদের চোখ চলে যায়। অনেক সময় ব্যক্তিগত ভাবে বা জাতিগতভাবে অনেকের মধ্যেই নাই নাই খাই খাই ভাব চলে আসে। আপনি যদি আপনার কোন প্রতিবেশী বা বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেন, ভাই কেমন আছেন! তিনি বলবেন, 'এই কোন রকম আছি' বা 'এই কোন রকম কেটে যাচ্ছে' বা 'আর থাকা' ইত্যাকার নানা রকম ক্লান্তিকর কথা। এমনকি একজন কোটিপতিকেও যদি জিজ্ঞেস করেন, কেমন আছেন, তাকেও বলতে শুনবেন এই একই রকম ক্লান্তিকর কথা। একটি ভাল লেখা সম্পর্কেও মন্তব্য জিজ্ঞেস করুন খুব কম ব্যক্তিকেই বলতে শুনবেন লেখাটি ভাল হয়েছে। অধিকাংশকেই বলতে শুনবেন 'এই চলে আরকি' বা 'মোটামুটি হয়েছে'। অর্থাৎ সব কিছুতেই নেতিবাচক চিন্তা ও না শুকরিয়ার মনোভাব। আর এই মনোভাব সবসময় জীবনকে আরও হতাশা ও বিভ্রান্তির মধ্যে ঠেলে দেয়। কিন্তু আপনি যদি একবার প্রো-অ্যাকটিভ বা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারেন, তখন আপনি দেখবেন জীবনের সুন্দর দিকগুলো আপনার কাছে উদ্ভাসিত হচ্ছে, আপনার হৃদয়কে আনন্দে আপ্লুত করছে। প্রকৃতির নিয়মই হচ্ছে তেলে মাথায় তেল দেয়া। আপনি যদি একজন ইউরোপীয়কে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কেমন আছেন? তার যত কষ্ট বা অসুবিধাই থাক না কেন তিনি প্রথম বলবেন, 'ফাইন' অর্থাৎ বেশ ভাল আছি। এই বলার মধ্য দিয়ে তিনি ভাল জিনিসকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করেন। দুনিয়াতে এখন তাঁরা নিঃসন্দেহে বৈষয়িক দিক থেকে ভাল আছেন। এ প্রসঙ্গে আমরা হজরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর একটি বাণী স্মরণ করতে পারি। তিনি বলেছেন সালাম বিনিময়ের পর কেউ তোমার কুশল জিজ্ঞেস করলে বোলো, 'শোকর আলহামদুলিল্লাহ, আমি ভাল আছি।' দৈনন্দিন জীবনে আপনিও এই ভাল আছি বলার অভ্যাস গড়ে তুলুন। আপনি শোকর গুজার হোন। প্রাকৃতিক নিয়মেই আপনার ভাল থাকার পরিমাণ বেড়ে যাবে।

৪. দুঃখকে শক্তিতে রূপান্তরিত করুন: দুঃখ ছাড়া জীবন নেই। ব্যর্থতা ছাড়া সাফল্য আসে না। সফল মানুষরা সব সময় দুঃখ ও ব্যর্থতাকে শক্তিতে রূপান্তরিত করেন। পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কথা ধরুন। তিনি ছাত্র জীবনে আইসিএস অফিসার হতে চেয়েছিলেন। আইসিএস পরীক্ষায় ব্যর্থতা তাঁকে দিয়েছিল এক প্রচণ্ড দুঃখ। কিন্তু তিনি সে দুঃখকে কাটিয়ে উঠে ট্রেড ইউনিয়ন ও কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। জ্যোতি বসুর সাফল্য এখন কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। তিনি ভারতের এমন একজন মুখ্যমন্ত্রী যিনি সবচেয়ে বেশি সময় ক্ষমতায় আছেন।

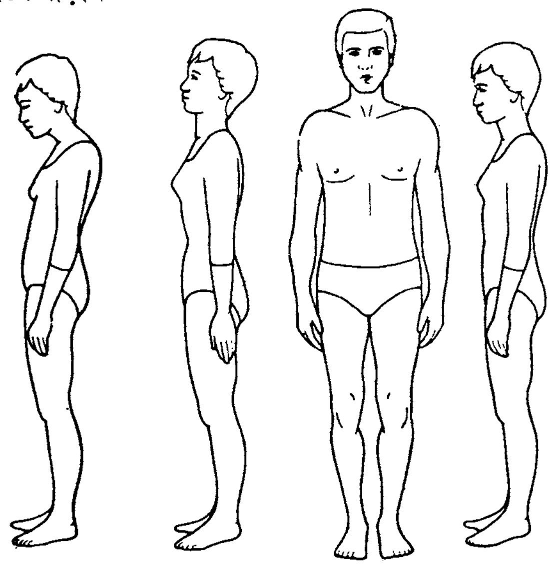
৫. দয়ালু হোন: আত্মকেন্দ্রিকতা ও 'আমারটা আগে' এই দৃষ্টিভঙ্গি জীবনকে এক ক্লান্তিকর বোঝায় রূপান্তরিত করে। পক্ষান্তরে দয়া ও সহানুভূতি জীবনকে আনন্দে রূপান্তরিত করে। দানবীর হাজী মোহাম্মদ মহসিন বলতেন, আমার তো জীবন একটাই। যে পথ দিয়ে এখন যাচ্ছি সে পথে তো আর নাও আসতে পারি। এই পথে কারও জন্যে যদি কোন কিছু করার থাকে তবে তা এখনই করা উচিত। দেরি করলে বা অবহেলা করলে কিছু করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে পারি। অন্যের উপকার যত ক্ষুদ্র আকারেই হোক আজ থেকেই শুরু করুন। দয়াশীল হোন। আলাদা আনন্দ পাবেন।

৬. মেঘের আড়ালেই রং ধনু রয়েছে: নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জীবনের আনন্দ সম্ভারকে কখনও উপভোগ করতে পারবেন না। হতাশা ও আনন্দ হচ্ছে এক পরস্পর বিরোধী অবস্থান। হতাশাবোধ আনন্দকে মাটি করে দেয়। আর হৃদয়ে আনন্দের অনুভূতি আনতে পারলে হতাশা পালিয়ে যায়। যাঁরা জীবনের আনন্দকে উপভোগ করেছেন, তাঁরা সবসময় কাঁটার আড়ালে গোলাপকেই দেখেছেন। হেলেন কেলার-এর জীবন দেখুন। শিশু বয়সে রোগ তার শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তি কেড়ে নেয়। তিনি কলেজ থেকে ডিগ্রি লাভ করেন। লেখক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সফল বক্তা হিসেবে সারা দুনিয়ায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁর এই অসাধারণ সাফল্যের পিছনে ছিল তাঁর প্রো-অ্যাকটিভ দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি লিখেছেন 'আমাকে এত কিছু দেয়া হয়েছে যে, কি দেয়া হয়নি তা নিয়ে ভাবার কোন সময় আমার নেই।' শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিহীন এক নারী যদি এত প্রো-অ্যাকটিভ ও প্রত্যয়ী হতে পারেন, শোকর গুজার হতে পারেন, তা হলে আপনি কেন পারবেন না। শোকর গুজার হোন! নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জীবনের আনন্দ সম্ভারকে উপভোগ করুন।

দেহকে টেনশন মুক্ত রাখুন

আমাদের শারীরিক অস্বস্তিও কোন কোন ক্ষেত্রে গুরুতর অসুস্থতার কারণ হতে পারে আমাদের দেহভঙ্গি। হাঁটা, দাঁড়ানো, বসা বা কাজ করার ভঙ্গি আমাদের শারীরিক টেনশন যেমন বাড়াতে পারে, তেমনি কোন গুরুতর অসুস্থতার জন্ম দিতে পারে। আপনি কিভাবে দাঁড়াচ্ছেন, কিভাবে বসছেন তার ওপর নির্ভর করবে আপনার মেরুদণ্ড ও শরীর আরাম পাবে না কষ্ট পাবে। আপনি যদি সোজা হয়ে না বসে কুঁজো হয়ে বসেন তা হলে আপনি ক্রমান্বয়ে কুঁজো হয়ে যাওয়া ছাড়াও বঞ্চিত হবেন শারীরিক আরাম থেকে। আবার ভুল পন্থায় আপনি কোন কিছু ওঠাতে গিয়ে মেরুদণ্ডে আঘাত পেতে পারেন, আক্রান্ত হতে পারেন স্পন্ডেলাইটিস বা ব্যাক পেইনে। আর শারীরিক ভঙ্গিকে সহজ ও সরল করে আপনি আপনার দৈহিক আরাম যেমন বাড়াতে পারেন, তেমনি বাড়াতে পারেন কর্মক্ষমতা। সহজ ভঙ্গি ও কাজ করার সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করলে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় পেশীগুলোই সঙ্কুচিত ও ব্যবহৃত হয়, অন্য পেশীগুলো থাকে শিথিল। তাই ঠিক যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই শক্তি ব্যয় হয়, শক্তির কোন অপচয় হয় না। দৈনন্দিন প্রতিটি কাজে—যেমন: দাঁড়ানো, বসা, হাঁটা, পড়া, কথা বলায় যদি আমরা এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করি তাহলে আমাদের শক্তিকে আমরা যে কোন বড় কাজে নিয়োগের জন্যে সঞ্চিত, সংহত ও প্রস্তুত অবস্থায় রাখতে পারব। আমরা সহজে ক্লান্ত হব না, অবসন্ন হব না বরং প্রফুল্ল মনে প্রাণবন্ত ভাবে কাজ করতে পারব।

সহজ ভাবে দাঁড়ান

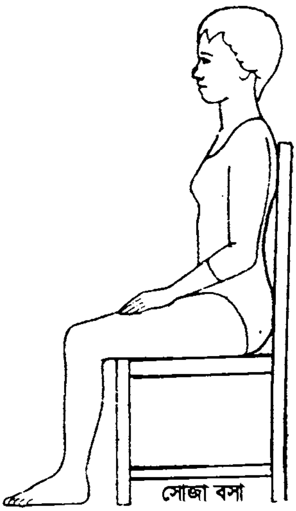


ঝুঁকে দাঁড়ানো   সটান দাঁড়ানো   সোজা দাঁড়ানো

যখন দাঁড়াবেন সহজ ভাবে সোজা দাঁড়ান। সামনের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়াবেন না। এতে মেরুদণ্ডের ওপর অহেতুক চাপ পড়ে এবং ঘাড় যেমন সামনের দিকে বেঁকে যায় তেমনি পিঠে কুঁজ সৃষ্টি হয়। এর ফলে বুক স্ফীত করতে অসুবিধা হয় এবং ফুসফুসে পর্যাপ্ত বাতাসের প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়। মেরুদণ্ডের ওপর অহেতুক চাপ পড়ায় স্নায়ুর ওপরও চাপ সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন অঙ্গে রক্ত চলাচল বাধাগ্রস্ত হয়। অপর দিকে সহজ ভাবে সোজা হয়ে দাঁড়ালে আপনাকে যেমন একটু লম্বা মনে হবে, তেমনি কাঁধ হবে প্রশস্ত, বুকের ছাতিও হবে চওড়া। বক্ষ স্ফীত হবে সহজে। পর্যাপ্ত অক্সিজেনের প্রবাহ অব্যাহত থাকবে ফুসফুসে। রক্ত চলাচলেও হবে উন্নতি। মেরুদণ্ডের ওপর অহেতুক চাপ পড়বে না। ফলে আপনি সহজে ক্লান্ত হবেন না। অবশ্য সোজা দাঁড়ানোর অর্থ বুক সামনের দিকে বাড়িয়ে মাথা পেছন দিকে হেলিয়ে সটান দাঁড়ানো নয়। ১ নং চিত্র দেখলেই আপনি ঝুঁকে দাঁড়ানো, সোজা দাঁড়ানো এবং সটান দাঁড়ানোর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারবেন।

সহজ ভাবে হাঁটা

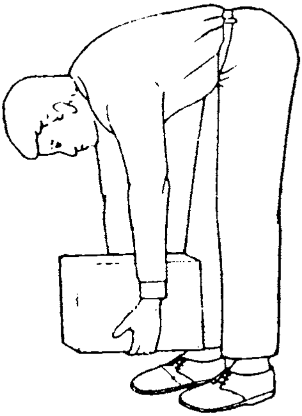
সোজা শরীর নিয়ে সামনের দিকে এগুনোই হচ্ছে সহজভাবে সোজা হাঁটা। এটিও খুব সহজ। মাথা সোজা রেখে সামনের দিকে দৃষ্টি দিয়ে সহজ ভাবে অগ্রসর হতে হবে। সামনের দিকে ঝোঁকার কোন প্রয়োজন নেই বা শরীরের চেয়ে মাথাকে আগে বাড়িয়ে দেয়ারও প্রয়োজন নেই। দৃষ্টিকে সমুন্নত রাখুন কিন্তু কষ্ট করে ঊর্ধ্বমুখী করবেন না। তাহলেই দেখবেন আপনি অনায়াসে হেঁটে যাচ্ছেন—মনে হবে ভেসে যাচ্ছেন। অনেকক্ষণ হেঁটেও কোন ক্লান্তি বোধ করবেন না। হেলতে হেলতে, দুলতে দুলতে সামনের দিকে এগুবেন না। হাত দুটো দুপাশে প্রশান্ত ভাবে পায়ের তালে নড়াচড়া করবে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামার সময় সহজভাবে পা ফেলবেন। সামনের পা সিঁড়িতে লেগে সোজা না হওয়া পর্যন্ত সে পায়ের ওপর শরীরের ওজন পুরোপুরি ছাড়বেন না। তা হলেই দেখবেন, অনেক সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠেও আপনি ক্লান্ত হননি। নামার সময়ও একই নিয়ম পালন করুন। হাঁটার এই সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করলে আপনি কম শক্তি ব্যয় করে অনেক বেশি হাঁটতে পারবেন—অনেক হেঁটেও ক্লান্ত হবেন না।



সোজা বসা

সোজা বসুন

সোজা দাঁড়ানোর বেলায় যে নিয়ম, সোজা বসার বেলায়ও শরীরের উপরের ভাগের ক্ষেত্রে তা পালনীয়। যখন চেয়ারে বসবেন, তখন মেরুদণ্ড বাঁকিয়ে আয়েশ করে বসা শরীরের জন্যে ও মেরুদণ্ডের জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর। অনেক সময় স্রেফ মেরুদণ্ড সোজা করে না বসার কারণেই মেরুদণ্ডে ব্যথার সৃষ্টি হয়। যখনই চেয়ারে বসবেন, মেরুদণ্ড সোজা রেখে পা মাটিতে স্পর্শ করে বসবেন; ঘাড় ও মাথা সোজা রাখবেন। এতে অহেতুক শারীরিক টেনশন সৃষ্টি হবে না। (চিত্র নং ২ দেখুন)।


ভুল পদ্ধতি

ভারী জিনিস ওঠানো

আপনার মেরুদণ্ডের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হতে পারে ভারী জিনিস নিয়ম বহির্ভূত ভাবে তুলতে গিয়ে। আমরা অনেক সময়ই বালতি বা কোন ভারী জিনিস দাঁড়ানো অবস্থায় তুলতে চেষ্টা করি। আবার অনেক সময় পানি ভর্তি ভারী বালতি এক হাত দিয়ে তুলি। এর যে কোনটিই মেরুদণ্ডে হঠাৎ টান পড়ে অসহনীয় ব্যথা সৃষ্টির কারণ হতে পারে। তাই যখনই ভারী জিনিস তুলবেন তখন বসে দু'হাত ও দু'পায়ের উপর সমান শক্তি ও ভর প্রয়োগ করে তুলবেন। তাহলে আপনি ভারী জিনিস তুলতে গিয়ে শারীরিক বিপত্তি ঘটানো থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন। (৩ নং চিত্র দেখুন)।

সহজ ভাবে দাঁড়ানো, সহজ ভাবে বসা, সহজ ভাবে হাঁটা ও সহজ ভাবে ভারী জিনিস তোলার এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করলে দৈহিক আরাম যেমন পাবেন, তেমনি আপনার কাজের উদ্দীপনা এবং প্রাণপ্রাচুর্যও বেড়ে যাবে।

দৃষ্টিশক্তি বাড়ান

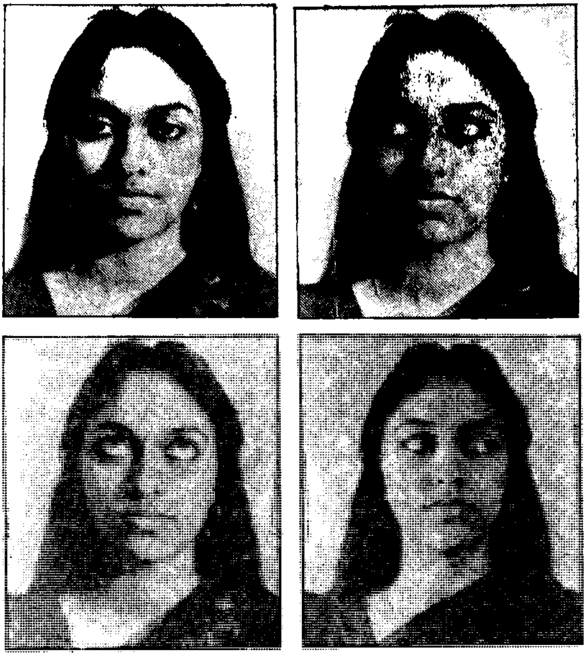
আত্মনির্মাণ ও আত্ম অনুভবের ক্ষেত্রে পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে শাণিত করার প্রয়োজন অপরিসীম। কারণ আমাদের অনুভবের ভিত্তি হচ্ছে পঞ্চ ইন্দ্রিয়। আর এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সবচেয়ে সক্রিয় ও কার্যকরী ইন্দ্রিয় হচ্ছে চোখ। বিজ্ঞানীরা বলেন, আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের শতকরা ৮৩ ভাগই আমরা পাই চোখের মাধ্যমে। তা সত্ত্বেও জ্ঞানের এত বড় মাধ্যমের যত্ন আমরা যথাযথভাবে নেই না। এবং এই না নেয়ার কারণে দ্রুত আমাদের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসে। চমশার কাচের পাওয়ার অস্বাভাবিক ভাবে বাড়তে থাকে। অথচ একটু যত্ন নিলেই আমরা চোখের স্বাভাবিক শক্তি দীর্ঘদিন ধরে রাখতে পারি। চোখের যত্ন নেয়ায় সারা দিনে যে সময় ব্যয় হবে তা মাত্র কয়েক মিনিট। আর এই যত্ন নেয়ার পদ্ধতিও বেশ সহজ।

চোখের যত্ন নেয়ার ক্ষেত্রে খাবারের গুরুত্ব অপরিসীম। খাবার অর্থাৎ সুষম খাবার। শাক সবজি একটু বেশি পরিমাণে খেতে হবে। শীতের দিনে গাজর, বাঁধাকপির পরিমাণটা একটু বেশি; ছোট মাছ—বিশেষত মলা-ঢেলা, কাচকি প্রভৃতি। আর চোখের জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে খাঁটি দুধ। প্রতিদিন আধ লিটার দুধ আপনার চোখের দৃষ্টিকে বহুদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখতে এবং চোখকে ছানি পড়া বা গ্লুকোমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

চোখের ব্যায়াম

চোখকে প্রাণবন্ত ও শক্তিশালী করার জন্যে রয়েছে খুব সাধারণ চোখের ব্যায়াম। এটা আপনি ঘরে অফিসে যে কোন স্থানে বসে করতে পারেন। শুধু যখন ব্যায়ামটি করবেন তখন চেয়ারে মেরুদণ্ড সোজা কিন্তু শরীর শিথিল করে বসতে হবে। শরীরের কোন পেশী অহেতুক শক্ত করে রাখবেন না। প্রস্তুত হয়ে বসেছেন? এবার প্রথমে দৃষ্টি সামনে সোজাসুজি রাখুন। ৫ সেকেন্ড পর মুখ সোজা রেখে চোখের মণি ডান দিকে ঘোরান। ৫ সেকেন্ড এভাবে থাকার পর চোখের মণি উপরে নিন। ৫ সেকেন্ড পরে চোখের মণি বাম দিকে নিন। আবার ৫ সেকেন্ড পরে চোখের মণি নিচে নিন। ৫ সেকেন্ড নিচের দিকে রাখুন। চোখ আপনার একবার ঘুরে এল। এভাবে ৫ বার ক্রমান্বয়ে চোখের মণি ডানে, উপরে, বামে, নিচে রেখে ব্যায়ামটি করুন। এরপর পুরো প্রক্রিয়া উল্টে দিন। অর্থাৎ প্রথমে বামে, তারপর উপরে, তারপর ডানে, তারপর নিচে। এভাবে ৫ বার ডান থেকে বাম দিকে আবার ৫ বার বাম থেকে ডানে করলেই ব্যায়াম সম্পন্ন হবে। (চোখের ব্যায়ামের ছবি দেখুন)

এ ছাড়া চক্ষু চিকিৎসক ডা. উইলিয়াম বেটস চোখের যত্ন ও দৃষ্টিশক্তি বাড়ানোর জন্যে বেশ কয়েকটি সুন্দর ও সহজ নিয়ম প্রচলন করেছেন। এই নিয়মগুলো সারা বিশ্বে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এ ব্যাপারে তিনি একটি বই লিখেছেন ১৯১৯ সালে 'বেটার আই সাইট উইদাউট গ্লাসেস' নামে। ডাক্তার বেটস মারা গেছেন, কিন্তু তাঁর পরামর্শ মত কয়েকটি সহজ নিয়ম পালন করে বিশ্বে বহু মানুষ তাদের দৃষ্টিশক্তি পুনরুদ্ধার বা সমুন্নত করেছেন। বেটস-এর পরামর্শ মত চোখের যত্নের কয়েকটি সহজ প্রক্রিয়া:



চোখের ব্যায়ামের বিভিন্ন পর্যায়

১. চোখ ঢাকা: আরাম করে শিথিলভাবে মেরুদণ্ড সোজা করে বসুন। সামনের টেবিলে কনুই রেখে হাতের তালু দিয়ে চোখ ঢাকুন। এমনভাবে ঢাকুন, চোখের পাতা যেন হাতের তালু স্পর্শ না করে। এরপর খুব মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্য কল্পনা করুন। বেড়াতে গিয়ে বা টিভিতে কোন প্রাকৃতিক দৃশ্য মোহিত করে থাকলে তা ভিজুয়ালাইজ করুন। কাজ করতে করতে বা পড়তে পড়তে যখনই আপনার মনে হয় চোখ ক্লান্ত হয়ে গেছে বা চোখে ব্যথা করছে, তখনই আপনি ৫ থেকে ১০ মিনিট এভাবে হাতের তালু দিয়ে চোখ ঢেকে কল্পনায় সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যে হারিয়ে যান। যে দৃশ্য কল্পনা করছেন, তার রং, গন্ধ, শব্দ সব পুরোপুরি অনুভব করার চেষ্টা করুন। ডা. বেটস বলেছেন মনের চোখে কোন জিনিস দেখলে বাস্তবে তা আরও বেশি স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

২. পলক ফেলুন: দশ-পনেরো সেকেন্ড পরপর চোখের পাতা মুহূর্তের জন্যে বন্ধ করার অভ্যাস করুন। এক দৃষ্টিতে না তাকিয়ে মাঝে মাঝে চোখের পাতা পড়তে দিন। এতে চোখ পরিষ্কার ও পিচ্ছিল থাকবে।

৩. কাছে ও দূরে তাকানো: কাছে ও দূরে তাকানোর অভ্যাস বাড়ান। এই তাকানোর অনুশীলন আপনি দুই হাতের দুআঙুল দিয়েও করতে পারেন। ডান হাতের তর্জনী চোখ থেকে আধ হাত দূরে রাখুন। আর বাঁ হাত যতটা সম্ভব দূরে নিয়ে তর্জনী সোজা করে রাখুন। এবার প্রথমে ডান—অর্থাৎ কাছের হাতের তর্জনীর দিকে দুই চোখ দিয়ে ৫ সেকেন্ড এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকুন। ক্ষণিকের জন্যে চোখের পাতা ফেলুন এরপর আবার দূরে অবস্থিত বাম হাতের তর্জনীর ডগায় এক দৃষ্টিতে ৫ সেকেন্ড তাকান। ক্ষণিকের জন্যে পলক ফেলুন। আবার কাছের

আঙুলের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন। এভাবে ১০ বার এই অনুশীলন করুন।

৪. পানির ঝাপটা: সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে প্রথম কাজ হবে চোখে পানির ঝাপটা দেয়া। বেসিনের সামনে গিয়ে চোখ পুরোপুরি বন্ধ করে প্রথমে ২০ বার ঈষদুষ্ণ পানির ঝাপটা দিন। এরপর ২০ বার ঠাণ্ডা পানির ঝাপটা দিন। আবার রাতে শোয়ার আগে শেষ কাজ হবে চোখে পানির ঝাপটা দেয়া। এবারে উল্টো ভাবে। অর্থাৎ প্রথম ২০ বার ঝাপটা দেবেন ঠাণ্ডা পানি দিয়ে এবং পরের ২০ বার ঝাপটা দেবেন ঈষদুষ্ণ পানি দিয়ে। এতে চোখে রক্ত চলাচল বাড়বে। চোখ হবে প্রাণবন্ত।

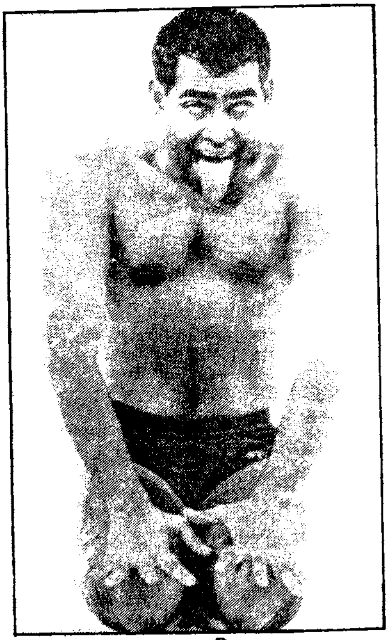
চোখের এই যত্ন যে কত উপকারী তা প্রখ্যাত লেখক অডলাস হাক্সলীর জীবন আলোচনা করলেই বোঝা যায়। ১৯৩৯ সালে হাক্সলীর বয়স যখন ৪৫, তখন তাঁর দৃষ্টিশক্তির দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। পড়ার জন্যে তিনি ব্যবহার শুরু করেন মোটা ম্যাগনিফাইং গ্লাসের চশমা। এ সময় তিনি বেটস মেথডের কথা শোনেন। এবং ২ মাস এই পদ্ধতির চর্চা করার পর তিনি চশমা ছাড়া পড়তে সক্ষম হন। পরে হাক্সলী নিজেও চোখের যত্ন বিষয়ে একটি বই লেখেন। বইটির নাম 'দি আর্ট অব সিইং'। তাতে তিনি লিখেছেন, শুধুমাত্র তিনিই নন, বেটস মেথডের সহজ নিয়ম পালন করে হাজার হাজার রোগী তাদের দৃষ্টিশক্তি উন্নত করতে সক্ষম হয়েছেন। অবশ্য এ উন্নতি সব সময়ই নির্ভর করে কতটা মনোযোগ ও একাগ্রতা নিয়ে আপনি অনুশীলন করছেন তার উপরে।

কণ্ঠস্বর বলিষ্ঠ ও আকর্ষণীয় করুন

আকর্ষণীয় কণ্ঠস্বরের অধিকারী আমরা সবাই হতে চাই। কিন্তু অডিও ক্যাসেটে নিজের গলার স্বরকে নিজের কাছেই অপরিচিত মনে হয়। আমাদের অধিকাংশেরই ব্যক্তিত্বের সাথে কণ্ঠস্বর ঠিক যেন সমন্বিত হতে চায় না। দেখতে নিজেদেরকে মনে হয় আকর্ষণীয়, বলিষ্ঠ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, কিন্তু কথা বলতে গেলে কথা জড়িয়ে যায়, বাক্য স্পষ্ট হয় না। ফ্যাঁসফেঁসে গলা বা নাকিস্বরের কথা ব্যক্তিত্বের প্রকাশকে দুর্বল করে দেয়। আবার কথা বলার সময় প্রকাশ পায় নিষ্প্রাণ একঘেয়েমি। আবার কারও কথা এত দ্রুত গলা থেকে বের হতে থাকে যে শ্রোতার কান তার সঙ্গে তাল মিলাতে না পেরে বিরক্ত হয়ে উঠে। তাছাড়া অনেকের কথা মুখে আটকে যায়, বেরুতে চায় না, আর নার্ভাস হয়ে গেলে বা উত্তেজিত হলে তোতলাতে থাকে। আবার কেউ কথার মাঝখানে অর্থহীন শব্দ যেমন, 'তো, তো তো, উঁ, হুঁ,' ইত্যাদি নানা অর্থহীন শব্দ মুদ্রাদোষের মত উচ্চারণ করে কথা ও বাক্যকে দুর্বল করে ফেলে।

নানা কারণে কণ্ঠস্বরের এই সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, মেয়েদের চেয়ে পুরুষদেরই কথা বলা বা কণ্ঠস্বরের সমস্যা বেশি প্রকট। কণ্ঠস্বর বিশেষজ্ঞ ড. মর্টন কুপার তাঁর 'উইনিং উইদ ইওর ভয়েস' গ্রন্থে চমৎকারভাবে বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, আমাদের কণ্ঠস্বর পরিণত হয়ে উঠতে থাকে ১২/১৩ বছর বয়সে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা ব্যবহার করতে শেখেন না। প্রায় অর্ধেক সংখ্যক লোক তাঁদের ছেলেবেলার কণ্ঠস্বরকেই পরিণত বয়সেও ব্যবহার করে চলেন। আর এই কণ্ঠস্বর হচ্ছে কিছুটা নাকিস্বর, চিকন এবং যেন জোরে কথা বলা হচ্ছে এরকম একটি ব্যাপার। অনেকেই কোন আলোচনায় অংশগ্রহণ করলে এমনভাবে কথা বলেন যেন কেউ গলা চেপে ধরেছে এবং সে অবস্থায় গলা থেকে আওয়াজ বেরুচ্ছে। পুরুষদের অধিকাংশই এই সমস্যাকে কাটানোর জন্য স্বরযন্ত্রে, বিশেষত গলার নিম্নভাগে জোর প্রয়োগ করে কথা বলেন। মার্কিন কূটনীতিবিদদের মধ্যে হেনরি কিসিঞ্জার এভাবেই কথা বলতেন। তিনি কণ্ঠস্বরকে জোরালো করে অন্যকে প্রভাবিত করতে চাইতেন, আর অন্যরা অধিকাংশ সময় মনে করত তিনি মনে করছেন অন্যদের শ্রবণ ক্ষমতা কমে গেছে।

তাহলে আপনার স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর কী হবে? ড. কুপার বলেছেন, আপনার খাবার টেবিল থেকে পোষা কুকুর যদি গোশতের টুকরোয় মুখ দিয়ে নিয়ে যেতে চায় তাহলে ধমকের স্বরে 'না' শব্দটি উচ্চারণ করলে যা শোনাবে তা-ই আপনার স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর। আপনি শব্দটি উচ্চারণ করে দেখুন তা অনেক গভীর, বলিষ্ঠ ও দৃঢ়। সবচেয়ে বড় কথা, এই স্বাভাবিক স্বরে কথা বললে আপনি বহুক্ষণ কণ্ঠযন্ত্রের উপর কোন রকম চাপ প্রয়োগ করা ছাড়া কথা বলতে পারবেন। গলা ভাঙবে না বা গলায় কোন অস্বস্তিও সৃষ্টি হবে না। ড. কুপার চমৎকারভাবে বলেছেন: একটু চর্চা করলেই আপনি সব সময় আকর্ষণীয় ও কমান্ডিং কণ্ঠস্বর প্রয়োগ করতে শিখতে পারবেন। আকর্ষণীয় কণ্ঠস্বরের অধিকারী শতকরা ৯০ জনই প্রচেষ্টা ও চর্চা দ্বারা তা অর্জন করেছেন। আপনার কণ্ঠস্বরকে আকর্ষণীয় মনে না হলে বা কথা বলার ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হলে নিম্নোক্ত অনুশীলনীগুলো চমৎকারভাবে আপনার সমস্যার সমাধান করবে এবং আপনি আকর্ষণীয় বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরের অধিকারী হবেন।



১. নাকিস্বর: আপনার কণ্ঠস্বরে যদি নাকিস্বর প্রাধান্য পায় তাহলে যোগব্যায়ামের একটি আসন আপনার জন্যে অত্যন্ত কার্যকর হবে। এটি হচ্ছে সিংহাসন। সিংহাসন খুব সহজ—হাঁটু ভেঙে বসুন, দুই পা নিতম্বের দুই পাশে থাকবে এবং পশ্চাদ্দেশ মেঝে স্পর্শ করবে। হাত দুটি থাকবে হাঁটুর উপরে। এরপর নাক দিয়ে লম্বা করে দম নিয়ে দম বন্ধ করে থুতনি দিয়ে কণ্ঠাস্থি স্পর্শ করুন এবং মুখ যতদূর সম্ভব হাঁ করে জিহ্বা সামনে বের করে নিয়ে আসবেন। এরপর আ···আ···আ শব্দ করে দম বের করবেন। দম ফুরিয়ে গেলে আবার নাক দিয়ে দম নিয়ে স্বাভাবিক স্বরে আ···আ···আ শব্দ করে মুখ দিয়ে দম বের করে দেবেন। এইভাবে দশবার করুন এবং প্রতিদিন নিয়মিত চর্চা করুন। তিন মাস পরই আপনি স্বাভাবিক বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরের অধিকারী হতে পারেন। যাঁদের তোতলামির সমস্যা রয়েছে এই অনুশীলন তাঁদের চমৎকার উপকারে আসবে।

২. একঘেয়ে ক্লান্তিকর স্বর: আপনার যদি একঘেয়ে ক্লান্তিকর স্বরে কথা বলার অভ্যাস থাকে তাহলে অনায়াসে একঘেয়ে স্বরকে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেন। ড. কুপার বলেছেন, আপনি যখন গুনগুন করে গান করেন তখন আপনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপনার স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর ব্যবহার করে থাকেন। তাই শাওয়ার ছেড়ে যখন গোসল করছেন তখন আপনি অনায়াসে গুনগুন করে গান গাইতে পারেন। প্রতিদিন নিয়মিত গোসল করার সময় এভাবে গুনগুনিয়ে গান গাইলে দু'তিন মাসের মধ্যেই আপনার কণ্ঠস্বরের একঘেয়ে ভাব কেটে যাবে।

৩. দ্রুত কথা বলা: অনেকে এত দ্রুত কথা বলেন যে শ্রোতার কান তার সাথে তাল মেলাতে পারে না। ফলে শ্রোতা মনে মনে তার উপর বিরক্ত হয়ে ওঠে। জনসংযোগ বা আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্রে আপনার এই অভ্যাস অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রমাণিত হতে পারে। আপনার এই দ্রুত গতির কথাকে স্বাভাবিক গতি বা ধীরলয়ে আনার জন্যে আপনি খুব সহজ একটি অনুশীলন করতে পারেন। চেয়ারে বসে দম নিন। এক মুহূর্ত দম বন্ধ রাখুন। তারপর দম ছাড়তে ছাড়তে বলুন—আসসালামু আলাইকুম, আপনি কেমন আছেন? প্রতিটি শব্দের মাঝে ২ সেকেন্ড করে বিরতি দিন। প্রতিদিন ১০ বার করে এই অনুশীলন করুন।

৪. মুদ্রাদোষ: আপনি আপনার আলাপ-আলোচনাকে রেকর্ড করলে যদি দেখেন আপনি অহেতুক 'হা-হুঁ—তো-তো—জানেন তো—বুঝলেন তো' এই ধরনের অপ্রয়োজনীয় শব্দ বাক্যের মাঝে উচ্চারণ করে থাকেন তা হলে এই মুদ্রাদোষ দূর করার জন্য আপনি সচেতন হয়ে উঠুন। আপনি যে এই অর্থহীন শব্দগুলো উচ্চারণ করছেন এ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলেই আপনার এই দোষ এমনিতেই চলে যাবে।

কণ্ঠস্বরের ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠে এই সহজ অনুশীলনগুলো করলে আপনি অচিরেই আকর্ষণীয় ও বলিষ্ঠ কণ্ঠের অধিকারী হয়ে উঠবেন।

ঠিকভাবে দম নিন প্রাণবন্ত হোন, প্রশান্ত হোন

আত্মনির্মাণ নিঃসন্দেহে একটি বড় ব্যাপার। তবে নির্মাণের প্রক্রিয়া আদৌ রাজসিক কিছু নয়। ছোট ছোট পদক্ষেপ, ছোট ছোট কাজ আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে বহুদূর। অবসর মুহূর্তে এ ধরনের একটি ছোট্ট পদক্ষেপ হচ্ছে 'দম'।

অবশ্য দম আমরা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই গ্রহণ করতে অভ্যস্ত। নাক ও শ্বাসনালী দিয়ে বাতাস আপনা-আপনিই ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং বেরিয়ে আসে। আমরা সাধারণভাবে দম কিভাবে আসছে ও যাচ্ছে তা খেয়ালই করি না। আমাদের অগোচরেই এই দমের মাধ্যমে শরীরের ভেতর যে কি পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে তা একবার চিন্তা করলে বিস্ময়ের কোন সীমা থাকে না। একবার দম নেয়ার সাথে সাথে শরীরের ৫ ট্রিলিয়ন রক্তকণিকা বাতাসের মুখোমুখি হয়। প্রতিটি রক্তকণিকায় রয়েছে ২৮০ মিলিয়ন হিমোগ্লোবিন অণু। আর প্রতিটি হিমোগ্লোবিন অণু আটটি করে অক্সিজেন পরমাণুকে ধরতে ও পরিবহন করতে পারে। প্রতিবার দমের সাথে ১১×১০^{২১}, অর্থাৎ ১১-র পাশে একুশটি শূন্য বসালে যে সংখ্যা হয় সে পরিমাণ অক্সিজেন পরমাণু শরীরে প্রবেশ করে। আমরা জানি আমাদের জীবকোষের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় খাবার হচ্ছে এই অক্সিজেন এবং তা রক্তের মাধ্যমে প্রতিটি জীবকোষে প্রেরিত হয়। আমাদের সচেতন প্রচেষ্টা ছাড়াই হার্ট এই কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। রক্তে পর্যাপ্ত অক্সিজেনের সরবরাহ থাকলে প্রতিটি কোষ তার প্রয়োজনীয় অক্সিজেন লাভ করতে পারে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কি রক্তে পর্যাপ্ত অক্সিজেন সরবরাহ করছি? শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষেত্রেই জবাব হচ্ছে—না। আমাদের মধ্যে শতকরা ৯০ জনই যেহেতু ঠিকভাবে বুক ফুলিয়ে দম নিই না তাই রক্ত পর্যাপ্ত অক্সিজেন পায় না বলে দেহকোষে প্রাণশক্তির অভাব সৃষ্টি হয়। আমরা অলস ও নির্জীব হয়ে পড়ি। আমাদের অবসাদ, ক্লান্তি, ক্রনিক সর্দি, নার্ভাসনেস্ এগুলোর অন্যতম প্রধান কারণ ঠিকভাবে দম না নেয়া। আমেরিকান বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ ডা. রুডি ট্যাডারহিল দীর্ঘ গবেষণার পর বলেছেন যে, ঠিকভাবে দম নিয়ে আমরা এই সমস্যাগুলো থেকে মুক্তি পেতে পারি।

ঠিকভাবে দম নেয়ার বিষয়টি প্রাচীন সাধকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সভ্যতার উষালগ্নে। তাই দমচর্চার ক্ষেত্রে আমাদের ঐতিহ্য কমপক্ষে পাঁচ হাজার বছর আগের। অবশ্য এর চর্চা প্রধানত সীমিত ছিল সাধক, দরবেশ ও মুনি-ঋষিদের মধ্যে। তাঁরা ঠিকভাবে দম নিতেন, সে কারণে অত্যন্ত প্রাণবন্ত থাকতেন। তাঁদের ত্বক, চোখ ও চেহারায় যে ঔজ্জ্বল্য ও আভা দেখা যেত তার অন্যতম কারণ ছিল ঠিকভাবে দম নেয়া, পর্যাপ্ত অক্সিজেন গ্রহণ। আপনিও ইচ্ছে করলে কয়েকটি সাধারণ নিয়ম পালন করে অত্যন্ত প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারেন।

দম নেয়ার ক্ষেত্রে আমাদের একটি প্রধান ত্রুটি হচ্ছে, আমরা বুক ফুলিয়ে দম নিই না, ফলে পর্যাপ্ত অক্সিজেন গ্রহণ করতে ব্যর্থ হই। দম নেয়ার সময় আমাদের যা স্ফীত হয় তা হচ্ছে ওপরের পেট। বুক তেমন না ফোলানোর কারণে পর্যাপ্ত বাতাস ফুসফুসে প্রবেশ করতে পারে না। ফলে দেহকোষ সবসময় প্রয়োজনীয় অক্সিজেন থেকে বঞ্চিত থাকে। আমরা জানি, বুকের পাঁজরের নিচেই আমাদের ফুসফুস অবস্থিত। এর নিজস্ব কোন পেশী নেই। তাই নিজে নিজে স্ফীত বা সঙ্কুচিত হতে পারে না। আমরা বুক ফোলালে ফুসফুস ফুলে ওঠে এবং অক্সিজেন ফুসফুসে প্রবেশ করে। পরিপূর্ণভাবে বুক ফোলালে একটি বাস্কেট-বলের সমপরিমাণ বাতাস

ফুসফুস ধারণ করতে পারে। তাই আমরা বুকটা যত ফোলাতে শিখব ফুসফুসের মাধ্যমে শরীরে অক্সিজেনের সরবরাহ তত বাড়বে এবং সেইসাথে বেশি পরিমাণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড শরীর বের করে দিতে পারবে।

উজ্জীবন

বুক ফুলিয়ে দম নেয়ার অভ্যাস একবার গড়ে তুললে তারপরে তা স্বংয়ক্রিয়ভাবে অব্যাহত থাকবে। আর এ অভ্যাস গড়ে তোলার জন্যে প্রথমে আপনি কোন চেয়ারে বা আসনে আরাম করে বসুন। চোখ বন্ধ করুন। মেরুদণ্ড রাখুন টানটান সোজা। কল্পনা করুন, নাকের সামনে বাতাসভর্তি একটা পেয়ালা রয়েছে। পেয়ালার পুরো বাতাসই দমের সাথে ফুসফুসে পাঠাতে হবে। কিন্তু একবারে নয়, চারবারে। কল্পনায় বায়ুভর্তি পেয়ালাকে চার ভাগ করুন। এবার পাত্র থেকে দম নেয়া শুরু করুন। 'হু…' করে নাক দিয়ে চার ভাগের প্রথম ভাগ বাতাস নিন, বুক একটু ফোলান। মুহূর্তমাত্র বিরতি দিয়ে 'হু…' করে নাক দিয়ে দ্বিতীয় ভাগ বাতাস নিন। বুক আরও একটু ফুলবে। আবার মুহূর্তের বিরতি দিয়ে নাক দিয়ে 'হু…' করে বাতাসের তৃতীয় ভাগ টেনে নিন। বুক আরেকটু ফুলবে। মুহূর্তের জন্য বিরতি দিয়ে 'হু…' করে পেয়ালার বাতাসের শেষ ভাগ টেনে নিন। এখন আপনার বুক পুরোপুরি ফুলে উঠবে।

এবার যতটুকু বাতাস নাক দিয়ে টেনে নিয়েছেন তা মুখ দিয়ে ছাড়তে শুরু করবেন। ছাড়বেনও ঠিক আগের প্রক্রিয়ায়, চারবারে। প্রথমে 'ফু…' করে এক-চতুর্থাংশ ছাড়ুন। বুক পুরোপুরি ফোলানোর পর যে অবস্থা হয়েছিল তা থেকে কমবে চার ভাগের এক ভাগ। মুহূর্তের বিরতি দিয়ে আবার 'ফু…' করে বুক থেকে দ্বিতীয় ভাগ বাতাস বের করে দিন। মুহূর্ত বিরতি দিয়ে আবার 'ফু…' করে তৃতীয় ভাগ বাতাস বের করে দিন। বুকের স্ফীতি আরও হ্রাস পাবে। আবার মুহূর্ত বিরতি দিয়ে 'ফু…' করে মুখ দিয়ে ফুসফুস থেকে শেষ বাতাসটুকু বের করে দিন। বুকের স্ফীতি কমে তা দাঁড়াবে সর্বনিম্ন পর্যায়ে।

দম নেয়ার এ প্রণালীটি পড়তে গিয়ে হয়তো আপনার বেশ জটিল মনে হবে। কিন্তু বাস্তবে করতে গিয়ে দেখবেন একেবারেই সোজা। সোজা লাগার সাথে সাথে মজাও পাবেন প্রচুর। এক কথায়, যে পরিমাণ বাতাস আপনার ফুসফুস গ্রহণ করতে পারে তা একবারে না নিয়ে এক মুহূর্ত করে বিরতি দিয়ে ৪ বারে নেবেন। এবং একই নিয়মে বিরতি দিয়ে ৪ বারে তা ছাড়বেন। নেবেন নাক দিয়ে, ছাড়বেন মুখ দিয়ে। আর এই পুরো প্রক্রিয়া শেষ করতে আপনার সময় লাগবে কয়েক সেকেন্ড মাত্র।

এভাবে আপনি প্রতিদিন ১০ মিনিট করে দম নেয়া ও দম ছাড়ার অভ্যাস করুন। ধীরে ধীরে কয়েক মাসের মধ্যেই অবচেতনভাবে বুক ফুলিয়ে দম নেয়ার অভ্যাস গড়ে উঠবে এবং দম নেয়ার ক্রুটিপূর্ণ পদ্ধতির অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়ে আপনি প্রাণপ্রাচুর্যে উজ্জীবিত হয়ে উঠবেন। যাঁরা একটু অলস প্রকৃতির তাঁরা সকালে ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর বিছানায় শুয়ে শুয়েও এভাবে দম নেয়ার অভ্যাস করতে পারেন। তাতেও একই ফলাফল পাবেন।

আবেশন

দম নেয়ার এ পদ্ধতি শরীর-মন শিথিলায়নে বিশেষ উপকারী। শরীর-মন শিথিল (relaxed) করার সময় এই পদ্ধতিতে দম গ্রহণ করার রেওয়াজ আছে। আবেশন পদ্ধতিতে আপনি দম নেবেন নাক দিয়ে। ছাড়বেন মুখ দিয়ে, ঠোঁট একটু ফাঁক করে। দম নেবেন লম্বা করে। বুকের পরিবর্তে ফুলবে উপরের পেট। অর্থাৎ

ফুসফুসের চাপ গিয়ে পড়বে উপরের পেটে দম নেয়ার সাথে সাথে উপরের পেট ফুলতে থাকবে। দম ছাড়ার সাথে সাথে পেট চুপসে আসবে। এক কথায় বলা যায়, নাক দিয়ে একটু ধীরলয়ে লম্বা করে দম নেবেন। দম নেয়ার সময় পেট ফুলবে। আবার ধীরে ধীরে 'ফু…' করে মুখ দিয়ে দম ছাড়বেন। শরীর-মন শিথিল করার সময় ১০ থেকে ২০ বার আবেশন পদ্ধতিতে দম নিন।

দম নিয়ন্ত্রণের আরও কতকগুলো সহজ পদ্ধতি রয়েছে যা চর্চা করলে আপনি নিঃসন্দেহে শারীরিক ও মানসিকভাবে উপকৃত হবেন:

১. চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ুন। হাত দুটো শরীরের দু'পাশে রাখুন। হাতের মুঠো বন্ধ করে ধীরে ধীরে দম নিতে নিতে হাত উপরের দিকে উঠিয়ে মাথার পিছনে নিয়ে রাখুন। আবার দম ছাড়তে ছাড়তে হাতদুটো আগের মত শরীরের দু'পাশে রাখুন। এভাবে ২০ বার করুন।

২. যে-কোন আসনে বা চেয়ারে মেরুদণ্ড সোজা করে বসুন। দুই নাসিকা দিয়ে ধীরে ধীরে বুক ভরে দম নিন। দম নেয়ার পর ধীরে ধীরে দুই নাসিকা দিয়েই দম ছাড়ুন। যতক্ষণে দম নেবেন তার চেয়ে কিছু বেশি সময় নিয়ে দম ছাড়ুন। দম নেবেনও দুই নাসিকায়, ছাড়বেনও দুই নাসিকায়। ১০ বার এভাবে দম নিন।

৩. কোন আসনে বা চেয়ারে সোজা হয়ে বসুন। ডান হাতের তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা ভাঁজ করে হাতের তালুতে রাখুন। এবার বুড়ো আঙুল দিয়ে ডান নাসিকা বন্ধ করে বাম নাসিকা দিয়ে ধীরে ধীরে দম নিন। দম নেয়া শেষ হলে ছোট আঙুল দিয়ে বাম নাসিকা বন্ধ করে ডান নাসিকা দিয়ে দম ছাড়ুন। দম ছাড়া শেষ হলে ডান নাসিকা দিয়ে ধীরে ধীরে দম নিন। দম নেয়া শেষ হলে বুড়ো আঙুল দিয়ে ডান-নাসিকা বন্ধ করে বাম নাসিকা দিয়ে ধীরে ধীরে দম ছাড়ুন। বাম নাসিকায় দম নিয়ে ডান নাসিকা দিয়ে ছাড়ার পর ডান নাসিকায় দম নিয়ে বাম নাসিকা দিয়ে ছাড়লে এক প্রস্থ দম নেয়া হয়। এভাবে ১০ বার দম নিন।

৪. হাঁটতে হাঁটতেও দম নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন আপনি। যাঁরা সকালে বা বিকেলে হাঁটেন তাঁদের হাঁটায় দম নিয়ন্ত্রণ একটা নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে। প্রথম অবস্থায় দম নিতে নিতে ৬ কদম হাঁটুন, আর দম ছাড়তে ছাড়তে ৮ কদম। ক্রমান্বয়ে কদমের পরিমাণ বাড়াতে পারেন। অর্থাৎ, দম নিতে নিতে ৮ কদম, ছাড়তে ছাড়তে ১২ কদম; আরও পরে দম নিতে নিতে ১০ কদম, ছাড়তে ছাড়তে ১৬ কদম। এতে আপনি হাঁটার উপকারের সাথে সাথে পাবেন দম-নিয়ন্ত্রণের উপকার।

তাছাড়া শিথিলায়নকালে দমের ওপর খেয়াল মনোযোগকে একাগ্র করতে যথেষ্ট সহায়তা করে। আপনি জানেন শিথিলায়নকালে দম ধীর ও দীর্ঘ হয়। তাই সচেতনভাবেও যদি আপনি আপনার দমকে ধীর এবং দীর্ঘ করতে পারেন তাহলে দেহমন শিথিল হয়ে আসবে। মেডিটেশনের মাঝে যদি কখনও আপনার মনে হয় আপনার ধ্যানভঙ্গ ঘটছে তাহলেও আপনি ধীরে ধীরে দম নিয়ে আবার ধীরে ধীরে দম ছাড়তে শুরু করুন। কয়েকবার দম নিয়ে আপনি আবার ধ্যানের গভীরে পৌঁছে যাবেন।

দমের ব্যাপারে একটি সহজ সূত্র হচ্ছে, যখন আপনি উদ্দীপিত হতে চাইছেন, তৎপর হতে চাইছেন, তখন বুক ফুলিয়ে দম নিন। লম্বা দম নিন। আর যখন আপনি শিথিল ও প্রশান্ত হতে চাইছেন তখন ধীরে দম নিন ও উপরের পেটে দম নিন। যখনই আপনি ক্লান্ত অনুভব করেন তখনই চোখ বন্ধ করে গভীরভাবে দম নিয়ে ধীরে ধীরে দম ছাড়ুন।

দিনে যখনই যেখানে সময় পান, পাঁচ-সাত-দশবার করে এভাবে দম নিন। বুক ফুলিয়ে দম নিন। ক্লান্তি ও অবসাদ দূর হয়ে যাবে। আপনি প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবেন। নিজের ব্যক্তিত্ব ও জীবন নির্মাণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ এগিয়ে যাবেন।

হাসুন! প্রাণ খুলে হাসুন!

হাসুন! প্রাণ খুলে হাসুন! হো তেই-এর মত হাসুন। হো তেই ছিলেন জাপানী সাধক। বুদ্ধের বাণী প্রচার করতেন। তাঁর পুরো শিক্ষাই ছিল হাসি। শুধুমাত্র হাসি। তিনি গ্রাম থেকে গ্রামে; বাজার থেকে বাজারে ঘুরে বেড়াতেন। গ্রামের মাঠে বা বাজারের মাঝখানে দাঁড়াতেন। তারপর হাসতে শুরু করতেন। এই হাসি ছিল তার বাণী। তাঁর হাসি যেমন ছিল প্রাণবন্ত, তেমনি ছোঁয়াচে। হৃদয়ের ভেতর থেকে উঠে আসত এই হাসি। দমকে দমকে সারা শরীর নাচিয়ে, পেটে ঢেউ তুলে উঠে আসত এই হাসি। হাসতে হাসতে মাটিতে গড়াগড়ি যেতেন তিনি। তার চারপাশে সমবেত জনতাও হাসতে শুরু করত। সেই হাসি ছড়িয়ে পড়ত চারপাশে। পুরো গ্রাম-জনপদের সবাই যোগ দিত হাসিতে। হাসতে হাসতে গড়াগড়ি যেত তারা।

গ্রামের লোকেরা হো তেই-এর জন্যে অপেক্ষা করত। কখন তিনি আসবেন। কারণ তিনি নিয়ে আসতেন হাসি, আনন্দ, উচ্ছলতা, আশীর্বাদ। তাঁর সাথে হাসিতে যোগ দিয়ে দুঃখ-শোক ভুলে যেত, রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত হত মানুষ। তাই গ্রামের লোক অপেক্ষা করত হো তেই-এর জন্যে।

'হাসিতে রোগ সারে' কথাটি শুনে কারও কারও হাসি পেতে পারে। কিন্তু কথাটি অত্যন্ত সত্য কথা। যুক্তরাষ্ট্রে স্যাটারডে রিভিউ পত্রিকার সম্পাদক নরমান কাসিনস-এর কথা ধরা যাক। ১৯৭০-এর দশকে মেরুদণ্ডের এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেন তিনি। ডাক্তাররা তাঁর রোগ মুক্তির সম্ভাবনা বস্তুত নাকচ করে দিলেন। কয়েক বছর প্রচণ্ড ব্যথায় কষ্ট পাওয়ার পর সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি কোন ওষুধ আর খাবেন না। পরিবর্তে তিনি নিজের চিকিৎসার জন্যে এক অভিনব প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করলেন। যখনই ব্যথায় অস্থির হয়ে উঠতেন তখনই তিনি তার প্রিয় হাসির ছবি লরেল এন্ড হার্ডি, ম্যাক্স ব্রাদার্স ইত্যাদি ছবির ভিডিও ছেড়ে দিতেন। তিনি হাসির বেদনানাশক গুণ উপলব্ধি করলেন। তিনি দেখলেন যে ৫ মিনিটের দম ফাটানো হাসি ২ ঘণ্টা পর্যন্ত ব্যথাবেদনা থেকে তাঁকে মুক্ত রাখে। আর এভাবে হাসতে হাসতেই কোন ওষুধ ছাড়া তিনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেন। তাঁর এই রোগমুক্তির বিবরণ সম্বলিত বই 'এনাটমি অভ এন ইলনেস' উঠেছিল বেস্ট সেলার-এর তালিকায়। নরমান কাসিনস ৭৫ বছর বয়সে ১৯৯০ সালে মারা যান।

হাসির নিরাময় ক্ষমতা নিয়ে ডাক্তাররা প্রচুর গবেষণা করেছেন এবং করছেন। যত গবেষণা হচ্ছে তত নতুন নতুন তথ্য বেরিয়ে আসছে। ডা. রেমন্ড মুদি তাঁর 'লাফ আফটার লাফ: দি হিলিং পাওয়ার অভ হিউমার' গ্রন্থে লিখেছেন, হাসির সাথে শরীরের স্বাস্থ্যগত অবস্থার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আমার পেশাগত জীবনে এমন অনেক ঘটনার সম্মুখীন হয়েছি যেখানে রোগীরা হাসি দিয়েই সুস্থতা অর্জন করেছে। ডা. মুদি বলেন যে, হাসির সাথে আয়ুর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। হাসির বেদনা লোপ করার ক্ষমতা প্রবল। হাসির সাথে ব্যথার সম্পর্ক একেবারে সাপেনেউলে। তিনি বলেন যে, হাসির সময় পেশীর টান অনেকটা আলগা হয়ে যায়। তাই দম ফাটানো হাসি পেশীর ব্যথা নিমেষে দূর করে দিতে পারে। ব্যাপারটিকে এভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়: অচেতনভাবে পেশীতে সৃষ্ট টেনশন মাথা ব্যথা সৃষ্টির কারণ বা বৃদ্ধির কারণ। হাসির সময় পেশী শিথিল হয়ে আক্রান্ত এলাকার টেনশন কমিয়ে দেয়। ফলে ব্যথা নিরাময় হয়। ডা. মুদি তার এক ডাক্তার বন্ধুর কথা উল্লেখ করে বলেন যে, তিনি তাঁর রোগীদের হাসিয়েই তাঁদের মাথা ব্যথা দূর করে দিতেন।

স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ডা. উইলিয়াম ফ্রাই হাসির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, অন্যান্য আবেগের চেয়ে হাসি একটি ভিন্নতর আবেগ। হাসি এক ধরনের ব্যায়ামের কাজ করে। হাসিতে পেশী সক্রিয় হয়ে ওঠে, হার্ট রেট বেড়ে যায়, দম দ্রুত হয়, রক্তের অক্সিজেন গ্রহণ ক্ষমতা বেড়ে যায়। ক্রীড়াবিদদের ব্যায়ামের অনুরূপ ফল পাওয়া যায় হাসিতে। হাত, মুখ, পা ও পেটের পেশীর একটা 'মিনি ওয়ার্ক আউট' হয়ে যায় হাসির ফলে। (এর আগে যখন আপনার হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গিয়েছিল, তখনকার পেটের পেশীর ব্যথা স্মরণ করুন)। হাসিতে ডায়াফ্রাম, থোরেক্স, সার্কুলেটরি ও এন্ডোক্রাইন সিসটেমেরও ব্যায়াম হয়। হাসি মস্তিষ্ককে ক্যাটেকোলামাইন হরমোন নিঃসরণে উদ্বুদ্ধ করে। আর এই ক্যাটেকোলামাইনই শরীরের নিজস্ব ব্যথানাশক এনডোরফিন নিঃসরণ করে রক্তপ্রবাহে।

ডা. উইলিয়াম ফ্রাই বিশ্বাস করেন যে, এক মিনিট প্রাণখোলা হাসি কয়েক মিনিট গভীর শিথিলায়নের মত উপকারী আর ২০ বার হাসি কয়েক মিনিট জগিং-এর সমান। শুধু তাই নয়, সাইকো-নিউরো-ইমিউনোলজির ক্ষেত্রে গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে নেতিবাচক আবেগ, যেমন বিষণ্নতা শরীরের ইমিউন সিসটেমকে দুর্বল করে দেয় আর এর ফলে ঠাণ্ডা লাগা থেকে ক্যান্সার পর্যন্ত যে কোন ব্যাধিই সহজে আক্রমণ করতে পারে। পক্ষান্তরে হাসি ইমিউন সিসটেমকে শক্তিশালী করে এবং যে কোন রোগ প্রতিরোধ, রোগ নিরাময় দ্রুততর করতে ইমিউন সিসটেমকে সাহায্য করে।

অবশ্য এ হাসিরও প্রকারভেদ রয়েছে। সব হাসিই নিরাময় করে না। কিভাবে হাসছেন, তা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, কেন হাসছেন তাও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। ডা. অলসন হাসিকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। এক—বিদ্রূপাত্মক হাসি। এ হাসি অন্যকে ছোট করে নিজেকে বড় করার চেষ্টা করে। তাই বিদ্রূপাত্মক হাসির কোন নিরাময় ক্ষমতা নেই। দ্বিতীয়টি, কোন হাসির কথা শুনে হাসা। এর নিরাময় ক্ষমতা রয়েছে। তৃতীয়ত, নির্মল প্রাণখোলা হাসি। ডা. রেমন্ড মুদি বলেন যে, এই তৃতীয় ধরনের হাসি হচ্ছে স্বর্গীয়। এ হাসির নিরাময় ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি। তিনি বলেন যে, এই নির্মল হাসি হাসার ক্ষমতা যার রয়েছে, সে নিজের ও অন্যের সব কিছুকেই অনেকটা নিরাসক্ত ভাবে দেখার ক্ষমতা রাখে। তারা নিজের বা অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা না হারিয়েও জীবনকে কৌতুকপূর্ণ ভাবে দেখতে পারে।

হাসির এই গুরুত্বের কারণেই মহানবী (সঃ) হাসিমুখে কথা বলার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন কারও সাথে হাসিমুখে কথা বলাও একটি সদকা অর্থাৎ দান। হাসিমুখে কথা বলা যেমন নিজের দেহমনের জন্যে উপকারী তেমনি হাসি হচ্ছে সংক্রামক। আপনি হেসে কথা বললে অন্যের মাঝেও এই হাসির প্রভাব পড়বে। তার চেহারায়ও হাসি ফুটে উঠতে পারে। তাই লস অ্যাঞ্জেলেসের ব্যথা বিশেষজ্ঞ ডা. ডেভিড ব্রেসলার হাসিখুশি ও ইতিবাচক মানুষের সাহচর্যে থাকার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। দীর্ঘ গবেষণায় তিনি দেখেছেন, 'হাসিখুশি ও ইতিবাচক মানুষ অন্যদের হাসিখুশি ও ইতিবাচক করে তোলে।' আসলে আপনি যাদের সাথে বেশি মিশবেন তাদের একটা প্রভাব আপনার উপর পড়বে। তাই নিজে হাসিখুশি ও আশাবাদী থাকুন। নিয়মিত হাসুন। দিনে ১৫/২০ বার হাসুন। হাসিখুশি ও আশাবাদী মানুষের সাথে বেশি বেশি মিশুন। আপনার জীবন হাসিময় হয়ে উঠবে।

হাসির মেডিটেশন

ভোরে ঘুম ভাঙার পর চোখ বন্ধ রাখা অবস্থায় বেড়ালের মত আড়মোড়া ভাঙুন।

শরীরের প্রতিটি পেশীকে টান টান করুন। কয়েক বার লম্বা দম নিন। ৩/৪ মিনিট সময় পার হওয়ার পর আপনি হাসতে চেষ্টা করুন। প্রথম দিকে হা-হা…হি-হি…করে হাসতে চেষ্টা করুন। হা-হা হি-হি শব্দ করে হাসতে চেষ্টা করার ফলে যে শব্দ সৃষ্টি হবে সেই শব্দই আপনাকে ক্রমান্বয়ে নির্মল প্রাণখোলা ও দমফাটানো হাসির রাজ্যে নিয়ে যাবে। আপনি হাসির রাজ্যে হারিয়ে যাবেন কয়েক মিনিটের জন্যে। প্রথম দিন চেষ্টা করেই হয়তো আপনি প্রাণখোলা হাসি হাসতে পারবেন না, হয়তো হা-হা হি-হি শব্দ করবেন। কারণ আপনি হয়তো হাসতে ভুলেই গেছেন। কিন্তু কয়েক দিন অনুশীলন করার পরই দেখবেন আপনার ভেতর থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসছে নির্মল স্বর্গীয় হাসি। হাসিতে ডুবে থাকুন ৫ মিনিটের জন্যে। আপনার এই স্বর্গীয় হাসি পুরো দিনটিকেই করে তুলবে আনন্দ উচ্ছ্বল।

যৌথ হাসি

হাসির মনোদৈহিক উপকারিতার জন্যে পৃথিবীর দেশে দেশে লাফিং ক্লাব বা হাসির ক্লাব রয়েছে। বোম্বের ডা. মদন কাটারিয়ার হাসির ক্লাব তো রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। আপনিও কয়েকজন বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজন নিয়ে এই হাসির ক্লাব গঠন করতে পারেন। যাঁরা সকালে বা বিকেলে হাঁটেন তারা হাঁটার সাথে সাথে কিছুক্ষণ হেসে নিতে পারেন। তাতে শরীর মন চাঙ্গা হয়ে উঠবে আরও দ্রুত।

যৌথ হাসির চর্চা খুব সহজ। ৫/৬ জন থেকে এক/দেড়শত জন একত্রে হাসতে পারেন। প্রথম গোল হয়ে দাঁড়ান সবাই। একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে হা-হা হো-হো হি-হি করে কৃত্রিম ভাবে হাসতে চেষ্টা করুন। দেখবেন সুড়সুড়ি শুরু হয়ে গেছে। একজন দিলখোলা দমফাটানো হাসি দেয়ার সাথে সাথে অন্যরাও কিছুক্ষণের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত হাসিতে ফেটে পড়বেন। কারণ হাঁসি ছোঁয়াচে। ৫/১০ মিনিটের পেট ফাটানো হাসি আপনার দেহমনকে চাঙ্গা রাখবে সারা দিন।

কাঁদুন! হাউমাউ করে কাঁদুন!

কাঁদুন। প্রাণ খুলে কাঁদুন। নীরবে অথবা হাউমাউ করে কাঁদুন। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদুন বা ডুকরে ডুকরে কাঁদুন। কান্নাকে মেয়েলী ব্যাপার বা অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার মনে করারও কোন প্রয়োজন নেই। সুস্থ মমতাভরা জীবনের জন্যে কান্না অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনোবিজ্ঞানীরা এখন বিবেচনা করছেন। আর কান্নাকে যত সহজ ব্যাপার মনে করা হয়, কান্না তত সহজ ব্যাপারও নয়। বললেই কাঁদা যায় না। কাঁদতে হলে একজন মানুষকে কোন গভীর বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতাকে মানসিকভাবে পুরোপুরি স্মরণ করতে হয় এবং এর সাথে জড়িত সকল দুঃখ ও আঘাতকে সেই মুহূর্তে মনে একিভূত করতে হয়। বেদনার্ত অনুভূতি প্রখর হলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে চোখ দিয়ে পানির ধারা প্রবাহিত হতে শুরু করে।

চোখের পানি ও কান্না মনের আবেগ প্রকাশের মাধ্যম। তাই মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন, দুঃখ ও বেদনার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে শরীর ও শরীরের সিসটেমকে রক্ষা করার এক প্রাকৃতিক নিরাপত্তা প্রক্রিয়া হচ্ছে কান্না। যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটার পল রামসে মেডিকেল সেন্টারের সাইকিয়াট্রি বিভাগের বায়োকেমিস্ট ড. উইলিয়াম ফ্রাই বলেন যে, দুঃখ, বেদনা, মানসিক আঘাত দেহে টক্সিন বা বিষাক্ত অণু সৃষ্টি করে আর কান্না এই বিষাক্ত অণুগুলোকে শরীর থেকে বের করে দেয়। এ কারণেই দুঃখ ভারাক্রান্ত ব্যক্তি ভালভাবে কাঁদতে পারলে নিজেকে অনেক হালকা মনে করে।

দুঃখজনিত চোখের পানি এবং জ্বালাপোড়ার কারণে চোখে আসা পানির রসায়নে কোন পার্থক্য আছে কি না এ নিয়ে গবেষণার জন্যে ড. ফ্রাই এক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। একদল ভলান্টিয়ারকে দুঃখে ভরা ছায়াছবি দেখতে দেয়া হয়। তাদেরকে বলা হয় ছবি দেখে কান্না পেলে চোখের পানি টেস্ট টিউবে রাখতে হবে। কয়েকদিন পর এদেরকেই সদ্য কয়টা পেঁয়াজের ঝাঁঝের সামনে বসিয়ে টেস্ট টিউবে চোখের পানি সংগ্রহ করা হয়। বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, দুঃখজনিত চোখের পানি আর পেঁয়াজের ঝাঁঝ লেগে আসা চোখের পানির রাসায়নিক গঠন পুরোপুরি আলাদা।

মনোবিজ্ঞানীরা অবশ্য রাসায়নিক প্রমাণ ছাড়াই অনেক আগে থেকেই বিশ্বাস করে আসছেন যে, কান্না শরীরের জন্যে অত্যন্ত উপকারী। তারা মনে করেন সমস্যা যে ধরনেরই হোক না কেন, সে সমস্যার সাথে জড়িত অনুভূতির ফলে সৃষ্ট টেনশনকে বের করে দেয় কান্না। মনোবিজ্ঞানী প্রফেসর ফ্রেডরিক ফ্লেচ বলেন যে, মানসিক চাপ ভারসাম্য নষ্ট করে আর কান্না ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করে। কান্না সেন্ট্রাল নার্ভাস সিসটেমকে মানসিক চাপ থেকে মুক্তি দেয়। না কাঁদলে সেই মানসিক চাপ বা স্ট্রেস শরীরে থেকেই যায়। কিন্তু নগর সভ্যতা আমাদেরকে দুঃখজনিত আবেগ অর্থাৎ কান্না প্রকাশে সবসময় বাধা দিয়ে এসেছে। আমাদের এখন ধারণা হচ্ছে কাঁদা এক ধরনের অভদ্রতা। তাই আমরা শুধু কান্নাকেই চেপে রাখি না এর সাথে সাথে ভয়, উৎকণ্ঠা, ক্রোধ সব কিছুকেই চেপে রাখতে সচেষ্ট থাকি। যা আমাদের দেহে ক্রমাগত টক্সিন বা বিষাক্ত অণু সৃষ্টিতে সহায়ক হয়। অথচ কান্না এক সম্পূর্ণ মানবীয় ব্যাপার। কান্না শরীরকে সুস্থ করে। কান্না সহানুভূতি ও মমত্বকে আকর্ষণ করে। অশ্রু মমত্ব বাড়ায়। আর মমতাই মানুষকে মানুষ করেছে।

কিন্তু কান্না না এলে কি করা যাবে? এ সমস্যা অনেকেরই। বিশেষত দায়িত্বশীল পুরুষরা কাঁদতে পারেন না। আপনি কাঁদতে না পারলে প্রথম সচেতন হয়ে উঠুন যে, আপনার কাঁদা প্রয়োজন। আপনার কাঁদা কেন প্রয়োজন একথা ঘনিষ্ঠজনদের বলুন। আপনি ইচ্ছেমত কাঁদুন। কারণ, না কাঁদার মানে হচ্ছে আবেগ প্রকাশের সহজ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখা। তবে অবিশ্বাস্য হলেও দেখা গেছে যে, বিষণ্নতায় আক্রান্ত ব্যক্তি সহজে কাঁদতে পারে না। দুঃখ, ক্ষতি বা বেদনার ব্যাপারে অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হলেই মানুষ বিষণ্নতায় আক্রান্ত হয়। আর গবেষণায় দেখা গেছে বিষণ্ন মানুষ তার বিষণ্নতা কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে শুরু করে কান্নার মাধ্যমে। তাই মনোবিজ্ঞানী ড. গে গায়েরলুম চমৎকার ভাবে বলেছেন, সমাজ যাদেরকে না কাঁদতে শিখিয়েছে, তাদের প্রথম কাজ হচ্ছে প্রাণ খুলে কাঁদতে শেখা।

ডা. লুম তার বই 'ইউর সেকেন্ড লাইফ'-এ কাঁদার কৌশল বর্ণনা করেছেন। একটি ঘরে আরাম করে বসুন। নিশ্চিত হোন টেলিফোন বা কোন লোক আপনাকে বিরক্ত করবে না। এবার বুকের উপর দুই হাত রাখুন। দ্রুত শ্বাস নিন। দ্রুত শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে শিশুর কান্নার মত আওয়াজ করুন। আওয়াজের প্রতি খেয়াল করুন। আওয়াজের পিছনের বেদনাকে অনুভব করুন। চাপা কান্নার মত আওয়াজ করুন। যে বিষয়গুলো আপনার দুঃখ-বেদনার কারণ হচ্ছে সেগুলো নিয়ে ভাবুন। বার বার চাপা কান্নার মত আওয়াজ করুন। আর এই কান্নার পেছনের দুঃখ-বেদনার কথা ভাবুন। নিজেকে মানুষ হওয়ার অনুমতি দিন। কাঁদতে আর অসুবিধা হবে না। প্রথম বারে সফল না হলে অনুশীলনের পুনরাবৃত্তি করুন। মাথাব্যথা করতে শুরু করলে কাঁদার অনুশীলন করুন। বেশিরভাগ সময়ই মাথাব্যথা আপনার ভেতরে সঞ্চিত টেনশনেরই বহিঃপ্রকাশ। তখন কাঁদতে শুরু করুন। কাঁদতে পারলেই দেখবেন কেমন হালকা লাগা শুরু করেছে। কান্নার মধ্যে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না, হাউমাউ কান্না বেশি উপকারী। ফোঁপানি সারা শরীরে মৃদু ও ছন্দময় তৎপরতা সৃষ্টি করে। এই ধরনের কান্না শুধু কণ্ঠনালীতেই নয়, বুকে, পেটে, নাভিমূলে এমনকি সাইনাসেও কম্পন সৃষ্টি করে এবং ভেতর থেকে আপনাকে প্রশান্ত করে তোলে।

মনোবিজ্ঞানী ডা. স্যাভারি বলেন যে, সচেতনভাবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদাও স্বাস্থ্যের জন্যে উপকারী। যখন আপনি সচেতনভাবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে চেষ্টা করছেন তখন আপনার মনোযোগ এক কেন্দ্রবিন্দুতে আবদ্ধ হচ্ছে। তখন আপনি আপনার ভয়, ক্রোধ, দুঃখ বেদনাকে অবলোকন করার চেষ্টা করুন। দম ছাড়তে ছাড়তে অবলোকন করুন এই টেনশন বা দুঃখ, রাগ, ক্ষোভ, ব্যথা-বেদনার কারণগুলো আপনাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এর ফলে আপনি আপনার জন্যে ক্ষতিকর আবেগকে স্বীকারও করলেন আবার সচেতনভাবে তা বেরও করে দিলেন। কান্নার মাধ্যমে আপনি আপনার দুঃখ, ক্ষোভ, ব্যথা-বেদনা সব বের করে দিন। তা না হলে ঘরের মধ্যে ময়লা জমিয়ে রাখলে তা যেমন সারা ঘরের পরিবেশকে দুর্গন্ধময় করে তোলে, তেমনি ভাবে জমানো দুঃখ আপনার সমগ্র অস্তিত্বকেই তমসাচ্ছন্ন করে দিতে পারে।

আপনি সহজে কাঁদতে পারলে আপনার সমস্যার সমাধান সহজ। কিন্তু যদি সহজে কাঁদতে না পারেন একটু চেষ্টা করুন। আমরা কোয়ান্টামের একটি ওয়ার্কশপে ২৫ জন ভলান্টিয়ার নিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার অনুশীলন করছিলাম। কাঁদতে হবে শুনে প্রথমে কাঁদা তো দূরের কথা, চাপা হাসি, খিলখিল হাসি, মুচকি হাসিতে ব্যস্ত হয়ে উঠল সবাই। প্রায় দশ মিনিট কেটে গেল হাসিতেই। তারপর আস্তে আস্তে সচেতন অনুশীলন শুরু হলো। ১ ঘণ্টার অনুশীলনে কাঁদলেন সবাই।

কান্নার অনুভূতি সবার কাছেই ছিল অপূর্ব। অনেকেই ছেলেবেলার পর এই প্রথম বার কেঁদেছিলেন। আপনিও একইভাবে আপনার দুঃখ, বেদনা, ব্যথা, অনুশোচনা, ক্ষোভকে কান্না রূপে বের করে শারীরিক-মানসিক সুস্থতার নতুন ছন্দে অনুরণিত হোন।

ক্রোধ প্রশমনের সহজ উপায়

ক্রোধ ও ক্ষোভ আপনার জীবনকে সহজেই বিষাক্ত করে তুলতে পারে। রাগের মাথায় আপনি এমন সব কাজ করে ফেলতে পারেন, যা আপনার জন্যেই ক্ষতিকর। ক্ষোভবশত এমন সব আচরণ করে ফেলতে পারেন, যা আপনার বিড়ম্বনা বৃদ্ধির কারণ হতে পারে। আবার রাগ ও ক্ষোভ দীর্ঘদিন অবদমিত রাখলে তা-ও আপনার মনোদৈহিক সমস্যা সৃষ্টির কারণ হতে পারে। তাই সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের জন্যে রাগ-ক্ষোভের সুষ্ঠু ও নিয়ন্ত্রিত বহিঃপ্রকাশ প্রয়োজন।

ক্ষোভের নিয়ন্ত্রিত বহিঃপ্রকাশ ঘটানো তেমন কঠিন কিছু নয়। যেমন ধরুন: আপনি মতিঝিলে যাবেন। মালিবাগের মোড়ে এসে আপনার বাহন দাঁড়িয়ে আছে। প্রচণ্ড যানজট। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট করে ঘণ্টা পার হয়ে যাচ্ছে, আপনার বাহন যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই আছে। কোন দিকেই কোন নড়াচড়া নেই। প্রচণ্ড গরম আর দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িগুলোর চালু ইঞ্জিনের ধোঁয়ায় এক যন্ত্রণাদায়ক অবস্থায় রাগে-ক্রোধে আপনি ফেটে পড়তে চাইছেন। এ ক্ষেত্রে আপনি অবশ্য অনায়াসেই আপনার ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারেন। গাড়ি থেকে বা রিকশা থেকে নেমে জোরে রাস্তার ওপর একটা লাথি মারুন বা দু'চারটে গালিগালাজ বর্ষণ করুন, বা গাড়িতে বসেই সীটের ওপর দু'তিন ঘা লাগিয়ে দিন। শারীরিকভাবে প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ সব সময়ই ক্রোধের সাময়িক উপশম ঘটাতে সাহায্য করে। আরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের প্রফেসর ড. রজার ডালড্রপ তাঁর 'ফ্রিডম ফ্রম অ্যাঙ্গার' গ্রন্থে ক্রোধের সাময়িক উপশমের এই প্রক্রিয়ার উপর বেশ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

রাগ প্রশমিত করার জন্যে দম গণনা করাও এক চমৎকার পদ্ধতি। যখন আপনি রেগে যাচ্ছেন, তখন দম গণনা করুন। এই প্রক্রিয়ায় আপনি লম্বা দম নিন। গণনা করুন ১। আর দম ছাড়তে ছাড়তে ভাবুন, বাতাসের সাথে সাথে শরীরের সব রাগ-ক্রোধ-ক্ষোভ ভেতর থেকে বাইরে চলে যাচ্ছে। এভাবে দশ পর্যন্ত গণনা করুন। প্রয়োজনে ২০ পর্যন্ত গণনা করুন।

হঠাৎ রাগ-ক্ষোভ অনুভব করলে এই প্রক্রিয়ায় আপনি দ্রুত প্রশান্ত হতে পারেন।

কিন্তু কিছু রাগ রয়েছে যা দূর-করা এত সহজ নয়। যেমন ধরুন, আপনার স্ত্রী/স্বামী বা বস্-এর কোন কথা বা আচরণ আপনাকে প্রচণ্ড রকম ক্ষুব্ধ করে তুলল। তখন কী করবেন? আপনি রাগে ফেটে পড়লে তা আপনার জন্যেই কোন মারাত্মক পরিণতি ডেকে নিয়ে আসতে পারে। তাহলে আপনি কি আপনার ক্ষোভের পিপা শক্ত ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখবেন? না, তা-ও করবেন না।

সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, আমরা ক্ষোভ ভুলে যেতে পারি, সময়ের সাথে সাথে ক্ষোভ এমনিতেই দূর হয়ে যায়। কিন্তু বাস্তব অবস্থা তা নয়। ড. ডালড্রপ বলেন, ক্ষোভ ভেতরে জমা রাখলে তা থেকেই যায়। অধিকাংশ মানুষই ২০/৩০/৪০ বছর ধরে ক্ষোভের বোঝা বয়ে বেড়ায়। এই জমাকৃত ক্ষোভই বহু রোগ বা ক্ষতিকর আসক্তির মূল হিসেবে কাজ করে।

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, ক্ষোভ অনুভব করলে দ্রুত তা প্রকাশ করে ফেলুন। তা না করলে ক্ষোভ জমে জমে জটিলতার বা মানসিক উত্তেজনার সৃষ্টি হবে। তখন আপনার ক্ষোভের প্রকাশ অত্যন্ত অপ্রীতিকর রূপ পরিগ্রহ করবে। আর আপনার ভেতর থেকে ক্ষোভ নিয়মিত বের হয়ে গেলে আপনি রেগে গেলেও সহজভাবেই

বলতে পারবেন, 'আমি আপনার সাথে একমত নই' বা 'তুমি যা বলছ তা আমার মনঃপূত হয়নি।'

তবে যে কোন সময়ই আপনার অনুভূতির প্রকাশে আপনি সংযত থাকুন। সুযোগ বুঝে আপনার রাগ উৎপাদনকারী ব্যক্তিকে আপনি আক্রমণাত্মক কথা বলে চুপসে দিতে পারেন, কিন্তু তা করতে যাবেন না। আবার চুপচাপ সব হজমও করবেন না। বরং এভাবে বলুন, 'আসুন, আমরা আমাদের মতপার্থক্য নিয়ে আলোচনা করি' বা বলতে পারেন, 'এই বিষয়টি নিয়ে আমি খুব কষ্ট পাচ্ছি, এ নিয়ে একটু খোলামেলা আলাপ করাই ভাল।' আপনার উদ্দেশ্য হবে উত্তেজনার উপশম করা, কাউকে দগ্ধ করা নয়।

আলোচনাকালে কাউকে অভিযুক্ত করবেন না। আপনি অপর ব্যক্তিকে আক্রমণ না করেও আপনার ক্ষোভের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারেন। সরাসরি অভিযোগ না করে রাগ বা ক্ষোভের কারণ বর্ণনায় 'আমি' বা 'আমার' শব্দটি ব্যবহার করেও আপনি অপর ব্যক্তিকে আপনার রাগের কারণ বলতে পারেন। 'আপনি আমাকে রাগিয়ে দিয়েছেন' না বলে 'যখন...এই ধরনের কিছু ঘটে তখন আমি ক্ষুব্ধ হই' এভাবে বলতে পারেন। এতে আপনি সরাসরি দোষারোপ করছেন না, আবার আপনার পুরো কথা বলাও হয়ে যাচ্ছে। যে কোন আলোচনায় এভাবে আপনার বক্তব্য রাখলে আপনি নিজেকে বেশ বলিষ্ঠ অবস্থানে দেখতে পাবেন।

আর যদি মুখে বলতে না পারেন, যদি মনে হয় কথা বলতে গিয়ে আপনি সব কিছু গুছিয়ে বলতে পারবেন না, তা হলে যার আচরণে আপনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন তাকে চিঠি লিখুন। পুরো ঘটনার ও ক্ষোভের বিস্তারিত বিবরণ দিন। আপনি হয়তো কোনদিন সে চিঠি ডাকে পাঠাবেন না, তবুও ওই লেখার মধ্য দিয়েই আপনার ক্ষোভ ভেতর থেকে বেরিয়ে গেল। আপনি বেঁচে গেলেন ভবিষ্যৎ জটিলতা থেকে।

ক্ষোভ প্রশমনে মেডিটেশন

'কোয়ান্টাম মেথড' বই-এ ক্ষোভ, রাগ, ঘৃণা তথা মনের বিষ দূর করার প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে। ক্ষোভ দূর করার জন্যে আপনি নিম্নোক্ত প্রক্রিয়াও অনুসরণ করতে পারেন। প্রথমত শিথিলায়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে আলফা স্টেশনে আপনার ওয়েটিং রুমে প্রবেশ করুন। আপনার চেয়ারে বসুন। ওয়েটিং রুমে আপনার চেয়ারের সামনে আর একটি চেয়ার বসান। এবার অবলোকন করুন, আপনার সামনের চেয়ারে আপনার প্রতিপক্ষ এসে বসেছে।

এবার তাকে বলুন আপনি তার ওপর কতখানি ক্ষুব্ধ। এক এক করে আপনার ক্ষোভের কারণগুলো তাকে বলুন। বলুন, আমি এই...কারণে ক্ষুব্ধ, আমি এই কারণে মনে কষ্ট পেয়েছি, এই কারণে আমি রেগে গেছি...।

রাগ প্রকাশ করার সময় কখনও বলা উচিত নয়, তুমি আমাকে রাগিয়েছ, বা দুঃখ দিয়েছ...। অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে আপনার মধ্যে সব ব্যাপারেই অন্যকে দোষ দেয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হতে পারে।

বরং আমি ক্ষুব্ধ হয়েছি...আমি কষ্ট পেয়েছি...এ ধরনের প্রকাশভঙ্গি আপনার রাগ প্রকাশের সাথে সাথে যে কোন ঘটনার ব্যাপারে আপনার অনুভূতি বা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে সাহায্য করবে।

আলফা স্টেশনে ওয়েটিং রুমে আপনি নিঃসঙ্কোচে আপনার বক্তব্য প্রকাশ করুন...কল্পিত ব্যক্তি যে চেয়ারে বসে আছে সেখানে কল্পনায় যতবার খুশি কাগজের লাঠি দিয়ে আঘাত করুন...ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত বলতে থাকুন...আঘাত করতে থাকুন। যখন মনে হবে যথেষ্ট বলা হয়েছে, তখন নিয়মমত মনের বাড়িতে গিয়ে ইতিবাচক কল্পচিত্র বা মনছবি নির্মাণ করে পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় ফিরে আসুন।

লজ্জা কাটানোর ৫টি পন্থা

সন্দেহ নেই লজ্জা একটি সুন্দর আবেগ। লজ্জা মানুষকে ক্ষতিকর প্রবৃত্তি থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। লজ্জার কারণেই আমরা অশোভন কার্যকলাপ থেকে সাধারণত নিজেদের বিরত রাখি। লজ্জার কারণেই আমরা অনেক সময় লোভনীয় কিন্তু সামাজিকভাবে অগ্রহণযোগ্য কার্যকলাপ, যেমন চুরি, পরকীয়া প্রেম ইত্যাদি থেকে বিরত থাকি।

লজ্জার বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে মুখ কান লাল হয়ে ওঠা। অভিযোগকারীর চোখের দৃষ্টি থেকে নিজের চোখকে নামিয়ে নেয়া, মুখ-কাঁধ নত হয়ে আসা। অর্থাৎ, লজ্জা পেলে আমরা অভিযোগকারীর সামনে নিজেকে হারিয়ে ফেলি। কারও কারও মনে হয় মাটি ফাঁক হয়ে গেলে তার মাঝে হারিয়ে যেতে পারলেই যেন বাঁচা যেত। লজ্জা পাওয়ার অর্থ অনেকটা নিজেকে লুকিয়ে ফেলা। আর লজ্জা সব সময় যেহেতু নিজেকে লুকানোর চেষ্টায় লিপ্ত থাকে তাই লজ্জাকে সহজে শনাক্ত করা যায় না।

লজ্জা স্বাভাবিকভাবে হিতকর হলেও এর অতিরিক্ত প্রভাব বা বিকৃত প্রভাব যে কোন মানুষের জীবনকে বিড়ম্বিত এমনকি বিপর্যস্ত করে তুলতে পারে। লজ্জা তখন ক্রোধ, একগুঁয়েমি, অহঙ্কার, বিষণ্নতা, মৌনের মুখোশ পরিধান করতে পারে। মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন, অধিকাংশ বিষণ্নতার ভিত্তি হচ্ছে লজ্জা। আবার হঠাৎ অস্বাভাবিক রাগের বহিঃপ্রকাশও ঘটতে পারে ছোটবেলার কোন লজ্জাকর ঘটনার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে।

লজ্জাকে অনেকে অপরাধবোধের সাথে মিলিয়ে দেখেন। কিন্তু এই দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আমরা করেছি বা করার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছি এমন কোন কাজের জন্যে খারাপ লাগা হচ্ছে অপরাধবোধ। যেহেতু এটি কাজের সাথে জড়িত তাই অপরাধকে স্বীকার করে নিয়ে, সে ব্যাপারে ক্ষমা চেয়ে নিষ্কৃতি পাওয়া যেতে পারে। কোন মন্দ বা খারাপ কাজের সাথে অপরাধবোধ জড়িত। আর লজ্জায় আমরা নিজেদেরই খারাপ মনে করে থাকি। তাই অপরাধবোধ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সহজ, কিন্তু লজ্জা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া কঠিন।

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, প্রতিটি মানুষই কোন না কোন ধরনের লজ্জার শিকার হতে পারে। আমরা সাধারণত তিনটি ব্যাপারে লজ্জিত হই: দুর্বলতা, নোংরামি, ত্রুটি। নিজের শরীর নিয়েও লজ্জা থাকতে পারে। যেমন আমি একটু খাবার কমাতে পারলে এ রকম মোটা হতাম না। বা, নাকটা কী বিশ্রী! বা, আমার পা কেমন ছোট আর দুর্বল। আমরা এ ধরনের লজ্জাকে সুপ্ত লজ্জা বলে অভিহিত করতে পারি।

সুপ্ত লজ্জায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা সব সময় লজ্জা ও গর্বের নাগরদোলায় দুলতে থাকে। সাফল্য এদের সাময়িকভাবে গর্বের পথে নিয়ে যায়, আবার যে কোন ছোটখাট ব্যর্থতাও এদের মধ্যে লজ্জা ও অক্ষমতার অনুভূতিকে চাঙ্গা করে তোলে। এই সুপ্ত লজ্জার হাত থেকে যত নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, ততই জীবন আনন্দময় হয়ে উঠতে পারে।

সুপ্ত লজ্জার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে আপনি নিম্নোক্ত ৫টি পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন।

১. শনাক্তকরণের মাধ্যমে লজ্জাকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসুন। কোন্ মানুষ, স্থান,

বিষয় বা কার্যক্রমকে আপনি এড়িয়ে চলেন, তা শনাক্ত করুন। এদের এড়িয়ে চলার পেছনে সুপ্ত লজ্জার কারণগুলো বের করুন।

২. লজ্জার প্রকৃতি হচ্ছে লুকানো বা পালিয়ে বেড়ানো—তাই একে মোকাবিলা করতে হবে উল্টোভাবে। অর্থাৎ, যখন আপনি লজ্জায় চোখ নামিয়ে ফেলতে যাচ্ছেন, তখন সরাসরি চোখের দিকে তাকান এবং মনে মনে ভাবুন আমার এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই।

৩. ইচ্ছাকৃতভাবে যারা আপনাকে লজ্জাজনিত বিড়ম্বনায় ফেলতে চায় বলে আপনি মনে করছেন তাদের এড়িয়ে চলুন। তাদের সাথে সম্পর্কের ধরন পাল্টে ফেলুন।

৪. কোয়ান্টাম মেথড অনুসারে লজ্জা বিদূরণের জন্যে আপনি চমৎকার পন্থা অনুসরণ করতে পারেন। শিথিলায়নের সহজ প্রক্রিয়ায় আলফা স্টেশনে পৌঁছে আপনার জীবনের সবচেয়ে লজ্জাজনক ঘটনাগুলো এক এক করে হুবহু স্মরণ করুন। লজ্জাজনক ঘটনার পুরো দৃশ্য প্রতিটি খুঁটিনাটিসহ নিজের সামনে নিয়ে আসুন। ঘটনার সাথে জড়িত প্রতিটি রঙ, গন্ধ, স্বাদ ও তাপমাত্রাকে হুবহু অনুভব করার চেষ্টা করুন। পুরো দৃশ্যকে যতদূর সম্ভব হুবহু পুনরাবৃত্তি করুন। শুধু লজ্জাজনক পরিণতির অংশটুকু বাদ দিন। যে ঘটনা থেকে লজ্জার উদ্ভব হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি করার পর একটি নতুন ইতিবাচক দৃশ্য সংযোজন করে দৃশ্যের পরিসমাপ্তি ঘটান। আপনি দেখবেন লজ্জা দূরীভূত হয়ে গেছে।

বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী ডা. গারশেন কাউফম্যান নিরিবিলি বসে ভাবনার মাধ্যমে লজ্জাকর পরিস্থিতি থেকে রেহাই পাওয়ার চমৎকার অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি ছাত্রাবস্থায় একবার ক্লাসে বক্তৃতা করতে গিয়ে স্টেজে পড়ে যান। এতে ছাত্রদের মধ্যে হাসির রোল ওঠে। তিনি লজ্জা অনুভব করেন এবং এরপর থেকে তাঁর মনে বক্তৃতাভীতি বাসা বাঁধে। পড়াশুনা শেষ করার পর তিনি এই লজ্জাকে দূর করার জন্যে বেশ কিছুদিন নিরিবিলি বসে পূর্বের দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি করে তা শেষ করতেন ইতিবাচক দৃশ্যের অবতারণা করে। এভাবে তিনি লজ্জাজনক স্মৃতিকে সাফল্যের স্মৃতিতে রূপান্তরিত করেন। বক্তৃতা—যা ছিল এক সময়ে ডা. কাউফম্যানের জন্যে দুঃস্বপ্ন—এক আনন্দের বিষয়ে রূপান্তরিত হয়।

৫. লজ্জার সবচেয়ে বড় প্রতিষেধক হচ্ছে আত্মসম্মানবোধ ও আত্মবিশ্বাস। নিজেকে সম্মান করতে শুরু করুন। নিজেকে অনন্য সৃষ্টি হিসেবে ভাবুন। কোন মানুষই দোষত্রুটি মুক্ত নয়। আপনার মাঝেও ত্রুটি থাকতে পারে। সে ত্রুটিকে সহজে মেনে নিন। আর যে গুণগুলো রয়েছে তাকে বিকশিত করুন। আপনার বিকশিত গুণকেই মানুষ তখন সম্মান করবে। আপনারও আত্মসম্মানবোধ বেড়ে যাবে।

অপরাধবোধ: মুক্তির ৮টি কৌশল

এমন মানুষ নেই যে ভুল করেনি। জীবনের কোন না কোন পর্যায়ে মানুষ ভুল করে, অন্যের অনুভূতিকে আহত করে, অন্যের প্রতি অবিচার করে। অন্যায় বা ভুলের ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয় পাপবোধ বা অনুশোচনা। এই পাপবোধ বা অনুশোচনাকে ইতিবাচক ভাবে কাজে লাগাতে না পারলে মারাত্মক মনোদৈহিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। পাপবোধ আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে, আত্মসম্মানবোধকে ধ্বংস করে, জীবনের আনন্দকে মাটি করে দিতে পারে। পাপবোধ সম্পর্ক নষ্ট করা থেকে শুরু করে জটিল রোগ এমনকি ক্যান্সার সৃষ্টিরও কারণ হতে পারে। অথচ একটু চেষ্টা করেই পাপবোধ বা অনুশোচনাকে আপনি ইতিবাচক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারেন। নিম্নের ৮টি পদক্ষেপ গ্রহণ করে আপনি অনায়াসে আপনার পাপবোধকে ভবিষ্যৎ সাফল্যের ভিত্তিতে রূপান্তরিত করতে পারেন। আপনার পাপবোধ বা অনুশোচনাই হয়ে উঠতে পারে আপনার আত্মনির্মাণের হাতিয়ার।

১. পাপবোধকে সতর্ক সংকেত হিসেবে বিবেচনা করুন: যে কোন পাপবোধ মনে করিয়ে দেয় যে কিছু একটু ভুল হয়ে যাচ্ছে। যখনই পাপবোধ আপনাকে পেছনে ফিরে তাকাতে, নিজের কাজ পর্যালোচনা করতে, নিজের আচরণ পরিবর্তন করতে উদ্বুদ্ধ করে তখন অনুশোচনা আপনার এক নম্বর মিত্রে পরিণত হয়।

প্রখ্যাত মার্কিন গায়ক নেইল ডায়মন্ড-এর কথা ধরুন। ১৯৭২ সালে নেইল ডায়মন্ড যখন খ্যাতির শীর্ষে তখন তিনি সঙ্গীত জগৎ থেকে চার বছরের বিরতি নিয়ে নিলেন। কারণ ছিল বিবেকের দংশন। তিনি নিজেকে বললেন প্রথম বিয়ে তালাক হয়েছে। দ্বিতীয় বিয়েও ভেঙে যাক এটা আমি চাই না। তিনি পুরো ৪৮ মাস কাটালেন নিজেকে নিয়ে, স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে। নেইল ডায়মন্ড এই বিরতির মাধ্যমে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি রোধ করলেন। ৪ বছর পর তিনি নিজেকে আবিষ্কার করলেন প্রশান্ত ও সুখী মানুষ হিসেবে। মঞ্চে তিনি পেলেন আগের চেয়ে অনেক সহজ সাবলীলতা। ব্যক্তি হিসেবেও তিনি হলেন আগের চেয়ে অমায়িক ভাল মানুষ।

২. পাপবোধের গুরুত্ব অনুভব করুন: পাপবোধ বা অনুশোচনায় সাড়া দিয়ে একজন মানুষ যখন নিজের ভুল, ক্ষতিকর, আক্রমণাত্মক, বিদ্বেষাত্মক ও ধ্বংসাত্মক আচরণকে সংশোধন করে তখন এই পাপবোধই আত্মউন্নয়নের সহায়ক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। তাই নিজের প্রতি বা মানুষের প্রতি কোন ভুল বা অন্যায় করলে অবশ্যই অনুশোচনা করা উচিত। অনুশোচনাই মন্দকে ভালয় রূপান্তরিত করার ক্ষমতা রাখে।

৩. পাপবোধকে বিশ্লেষণ করুন: সতর্কতার সাথে বিশ্লেষণ করে পাপবোধকে কমানো বা সংশোধন করা যেতে পারে। এমনকি তা পুরোপুরি দূর করা যেতে পারে।

কর্মজীবী মহিলা নাসরীন মেয়ে অসুস্থ হলেই পাপবোধে ভুগতেন। তিনি চাকরি করেন। মেয়ের যত্ন ঠিকভাবে নিতে পারেন না তাই মেয়ে অসুস্থ হয়। এই ছিল তাঁর ধারণা। তিনি এ সমস্যার কথা আমাকে জানালে আমি পুরো বিষয়টিকেই বাস্তবতার আলোকে বিশ্লেষণ করে দেখতে বললাম। তিনি দেখলেন চাকরি ছেড়ে

দিলে মেয়েকে নিয়ে জীবন ধারণ করার বিকল্প কোন আয়ের উৎস নেই। তাই চাকরি ছেড়ে দেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। যেহেতু এটা সম্ভব নয়, তাই এ নিয়ে পাপবোধ ও অনুশোচনা করার কোন যুক্তি নেই। নাসরীন যেহেতু পাপবোধকে বাস্তবতার আলোকে বিশ্লেষণ করছেন, এবং বুঝতে পেরেছেন এটি তাঁর ইচ্ছাকৃত কোন অপরাধ নয়, তাই এই পাপবোধ তাঁর বা তাঁর মেয়ের জীবনে আর কোন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারেনি।

৪. যুক্তিসঙ্গত কাজ করুন: নিজের পাপবোধ বিশ্লেষণ করে সে ব্যাপারে যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। কিছু করতে পারেননি বা কোন ভুল করে ফেলেছেন—এই অপরাধবোধ দূর করার জন্যে সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। প্রয়োজনে ক্ষমা চান, ভুল শোধরানোর সুযোগ থাকলে ভুল সংশোধন করে নিন। অপরাধবোধ যেন আপনাকে এমন কিছু না করায় যা অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয়।

আমেরিকার ঘটনা এটি। এক ধনাঢ্য ব্যক্তি তার মৃত ভাইয়ের সমাধি স্তম্ভ বানিয়েছিল, পাথরের তৈরি প্রমাণ সাইজ মার্সিডিজ বেঞ্জ গাড়ির মডেল দিয়ে। দেখলে মনে হবে একটি মার্সিডিজ গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ভাস্কর একটি মাত্র পাথরের খণ্ড থেকে এক বছর পরিশ্রম করে গাড়ির মডেল তৈরি করে। খরচ পড়ে আমাদের টাকায় ৮০ লক্ষ টাকা। এটি তৈরির কারণ হচ্ছে ভদ্রলোকের ভাই গাড়ির জন্যে আবদার করেছিলেন। ব্যস্ততার কারণে আজ দেই কাল দেই করে কেনা হয়নি। এর মধ্যেই দুর্ঘটনায় ভাই মারা যায়। ভদ্রলোক অনুশোচনায় পড়ে যান। তাই নিজের অপরাধবোধের মাসুল হিসেবে ভাইয়ের কবরের উপর পাথরের মোটরগাড়ি বসিয়ে দেন। এটা এক ধরনের চরম ব্যবস্থা। একে পাগলামিও বলা যায়। এ সব না করে তিনি টাকাটা আর্তমানবতার সেবায় দান করলে মানুষের উপকার হত আর তার ভাইয়ের আত্মাও শান্তি পেত। আপনার বেলায় কখনও এমন ঘটনা ঘটলে আর্তমানবতার কল্যাণমূলক কাজে অর্থ ব্যয় করুন। মৃতের আত্মা শান্তি পাবে।

৫. কেউ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়: পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ নেই যে ভুল করেনি। তাই কখনও ভুল করে ফেললে ভুল স্বীকার করুন। ক্ষমা চেয়ে নিন। নিজেকে ক্ষমা করে দিন। সব সময় মনে রাখবেন, আপনি ভুলের ঊর্ধ্বে নন। আপনি ভুল করতে পারেন। তাই ভুল নিয়ে অহেতুক ও অপ্রয়োজনীয় অনুশোচনা করবেন না। ক্ষমা চাওয়া ও ক্ষমা করার মধ্য দিয়ে নতুনভাবে সবকিছু শুরু করুন।

৬. ভুল থেকে শিক্ষা নিন: একই ভুলের পুনরাবৃত্তি শুধু নির্বোধরাই করে থাকে। বুদ্ধিমানরা সব সময় নিজের ভুল থেকে শিক্ষা নেয়। ভুলের পুনরাবৃত্তি থেকে বিরত থাকে। তাই একই ভুল বা একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকুন।

৭. তওবা করুন: কোন অপরাধ বা পাপ করে ফেললে আন্তরিকভাবে অনুশোচনা করুন। পরম করুণাময়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তওবা করুন। আপনার পাপ মোচনের জন্যে করুণাময়ের সাহায্য নিন। আপনি জানেন স্রষ্টা ক্ষমাশীল; ক্ষমা হচ্ছে স্রষ্টার সবচেয়ে বড় গুণ। আপনার যে কোন পাপকে তিনি ক্ষমা করে দিতে পারেন। তাই আন্তরিকভাবে অনুশোচনা করুন। তওবা আপনাকে নবজাত শিশুর মত নিষ্পাপ ও সম্ভাবনাময় করে তুলবে।

৮. সব ভুলে যান, সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতে যাত্রা করুন: ভুল সংশোধন ও আচরণ

পরিবর্তন করার জন্যে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণ করার পর পাপবোধ বা অপরাধবোধ মন থেকে নির্বাসিত করুন। ভুলে যান অতীত ভুলকে। সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের পানে এগিয়ে যান। এই ভুলে যেতে পারাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অপরাধবোধকে মন থেকে পুরোপুরি বিদায় করতে পারলেই আপনি কল্যাণময় নতুন জীবন শুরু করতে পারবেন।

অপরাধবোধ বা পাপবোধ থেকে নিজের উত্তরণ ঘটানোর জন্যে উপরে উল্লেখিত কৌশল বা পদক্ষেপ অত্যন্ত কার্যকরী। আপনি অনায়াসে এই কৌশল অনুসরণ করে নিজের অনন্ত সম্ভাবনাকে বিকশিত করে এক প্রশান্ত ও মহিমান্বিত জীবনের অধিকারী হতে পারেন।

যা ঘুম যা

সকালবেলা ঘুম ভাঙলেও অনেকেরই বিছানা ছেড়ে উঠতে মন চায় না। এক ধরনের আলস্য যেন শরীরটাকে বিছানায় ডুবিয়ে রাখতে চায়। উঠি-উঠি করেও বিছানায় আধ ঘন্টা, এক ঘন্টা, এমনকি কখনও কখনও দু'ঘন্টাও পার হয়ে যায়। কারও কারও ক্ষেত্রে দেখা যায়, যখন আর না উঠলেই নয়, তখনই কোন রকমে জবরদস্তি করে বিছানা ছেড়ে উঠে তাড়াহুড়ো শুরু করে দেন। অনুশোচনা করেন, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন, না, আগামীকাল ঘুম ভাঙার সাথে সাথেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়বেন। কিন্তু দেখা যায়, পরদিনও সেই একই অবস্থা। এ অবস্থার শিকার যেমন ছাত্রছাত্রীরা, তেমনি বয়স্করাও। অনেকেই এ অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে অনেক ধরনের চেষ্টা চালিয়ে শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

অথচ সকালে সব ধরনের আলস্য ত্যাগ করে বিছানা ছেড়ে উঠে সময়মত নিজের কাজ শুরু করার খুব সহজ ও ফলপ্রসূ প্রক্রিয়া রয়েছে। কোয়ান্টাম মেথডে এই প্রক্রিয়ার নাম হচ্ছে 'যা ঘুম, যা'। প্রক্রিয়াটি খুবই সহজ। বিছানায় শুয়ে শুয়েই আপনি এ প্রক্রিয়া নিজের ওপর প্রয়োগ করতে পারেন। আপনি যে সময় বিছানা ছেড়ে উঠতে চান সে সময় ঘুম ভাঙার পর আপনি চিৎ হয়ে শোন্। মুখ বন্ধ করে নাক দিয়ে লম্বা করে দম নিন। বুক ভরে দম নেয়ার সাথে সাথে বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী দিয়ে নিজের নাক চেপে ধরুন। মুখ আগের মতই বন্ধ থাকবে। এখন নাক চেপে ধরার ফলে আপনি আর নিঃশ্বাস ছাড়তে পারবেন না। ফলে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইবে। আর তখনই আপনার ব্রেন দেহের সর্বত্র সঙ্কেত পাঠাবে: 'ফাইট অর ফ্লাইট'। শরীরের প্রতিটি স্নায়ু ও পেশী মুহূর্তে সজাগ ও সক্রিয় হয়ে উঠবে। যখন দেখবেন যে আর দম বন্ধ রাখা যাচ্ছে না, তখন নাক ছেড়ে দিন। স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস শুরু হয়ে যাবে। আর আপনি দেখবেন, ঘুম ও আলস্য কোথায় পালিয়ে গেছে। ২/৩ দিন এই 'যা ঘুম, যা' টেকনিক প্রয়োগ করার পর দেখবেন যে, বাস্তবে আর এ টেকনিক প্রয়োগ করতে হচ্ছে না, ঘুম ভাঙার পর টেকনিকের কথা স্মরণ করতেই ঘুম-আলস্য দুইই পালাচ্ছে। আর আপনি ঘুম ভাঙার পর সময়মত বিছানা ছেড়ে উঠে স্বচ্ছন্দে দিনের কাজ শুরু করতে পারছেন।

তরতাজা অনুভূতি নিয়ে দিনের কাজ শুরু করুন

আমরা সবাই সকালে একটা ঝরঝরে প্রাণবন্ত অনুভূতি নিয়ে জেগে উঠতে চাই। আমরা চাই তরতাজা অনুভূতি নিয়ে দিনের কাজ শুরু করতে। কিন্তু আমাদের মধ্যে ক'জন তা পারেন? বেশির ভাগই সকালে নিজে নিজে ঘুম থেকে উঠতে পারে না। ঘুম ভাঙলেও রাজ্যের ক্লান্তি ও অবসাদ বিছানা ত্যাগের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তাঁরা ঘুম থেকে উঠেন নেহায়েত বাধ্য হয়ে, দুনিয়ার ক্লান্তি ও বিরক্তি সহকারে। সকালে ঘুম থেকে জাগার পর যদি আবার ঘুমিয়ে পড়তে পারেন তাহলেই যেন তাঁরা বেঁচে যান। কিন্তু বাস্তব প্রয়োজনে তাঁদের জেগে থাকতে হয়। আর পরিপূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় আসতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। অনেক সময় অনেকের ঘণ্টাখানেক সময় লেগে যায়।

ঘুম থেকে জাগার সমস্যা শুধু আমাদের দেশেই সীমিত নয়, এই সমস্যা সর্বজনীন। আমেরিকার নিদ্রা বিশেষজ্ঞ ডা. জেরল্ড ম্যাক্সম্যান তার বই 'এ গুড নাইট্স্ স্লিপ'-এ লিখেছেন: ঘুম থেকে জাগার সমস্যা একটি সাধারণ অসুখ। ছয়শত আমেরিকানের উপর জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে যে, তাদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশেরও কম সংখ্যক লোক সকালবেলা তরতাজা অনুভূতি নিয়ে ঘুম থেকে উঠতে পারেন। শতকরা সতেরো ভাগ স্বীকার করেছেন যে ঘুম ভাঙার পরে পুরোপুরি সজাগ বা সচেতন হতে তাঁদের এক ঘণ্টা বা তার চেয়েও বেশি সময় লাগে। অনেকে পূর্ণ সজাগ হতে এর চেয়েও বেশি সময় নেন।

একটা সময় ছিল যখন আমাদের দেশের মানুষ খুব ভোরে উঠত। প্রবাদ ছিল: 'ফজরের হাওয়া লাখ টাকার দাওয়া'। ফজরের বাতাস যে স্বাস্থ্যের জন্যে অত্যন্ত উপকারী এ ব্যাপারে কারও কোন দ্বিমত না থাকলেও নগর জীবনে ভোরে না উঠাটাই একটা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। এর অবশ্য কারণও আছে। আগের মানুষ রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমোতে যেত আর সকালে উঠতও তাড়াতাড়ি। আর এখন কোন কাজ না থাকলেও আড্ডা, সামাজিকতা বা টিভি দেখা শেষ করে ঘুমোতে ঘুমোতে মধ্যরাত অতিক্রান্ত হয়ে যায়। তার ওপর অনেকের রয়েছে অনিদ্রা রোগ। বিছানায় শুয়ে শুয়ে নানান টেনশন, সমস্যা চিন্তা করতে করতে ঘুম আসতে চায় না। গভীর নিদ্রা না হওয়ায় সকালে ঘুম ভাঙলেও বিছানা ছেড়ে উঠাটা রীতিমত ঝামেলা বলে মনে হয়। যারা বেশি চা কফি পান করেন বা মদ পান করেন বা ঘুমের ওষুধ খান তাদের ঘুম থেকে জেগে উঠার সমস্যা আরও তীব্র। তাই বলা যেতে পারে, আধুনিক নগর জীবনে তরতাজা অনুভূতি নিয়ে আপনা-আপনি জেগে উঠা একটা বিরল বিষয়।

তবে আপনি যদি একটু সচেতন প্রচেষ্টা চালান তাহলে তরতাজা অনুভূতি নিয়ে দিনের কাজ শুরু করাটা কোন সমস্যাই নয়। এইজন্যে আপনি নিম্নোক্ত কয়েকটি পদক্ষেপ নিতে পারেন:

১। বিকালের চা কফি পরিহার করুন। সাধারণত ক্যাফেনের উত্তেজক প্রভাব তুঙ্গে পৌঁছায় ২ থেকে ৪ ঘণ্টার মধ্যে। কখনও কখনও ক্যাফেনের প্রভাব অব্যাহত থাকে ৭ ঘণ্টা পর্যন্ত। এবং কারও কারও মধ্যে এই প্রভাব ২০ ঘণ্টা পর্যন্ত বহাল থাকে। তাই চা কফি বা অন্য যে কোন ভাবে ক্যাফেন গ্রহণ করা থেকে ঘুমোতে যাওয়ার ৬ ঘণ্টা আগে থেকেই বিরত থাকা উচিত।

২. নিকোটিনের প্রভাব সরাসরি পড়ে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের ওপর। নিকোটিন স্নায়ুকে উত্তেজিত অবস্থায় রাখে। তাই ধূমপান বর্জন গভীর নিদ্রা ও তরতাজা অনুভূতি নিয়ে জেগে ওঠার জন্য একটি প্রধান পদক্ষেপ হতে পারে। দেখা গেছে, ধূমপায়ীরা ধূমপান ত্যাগের মাত্র তিনদিনের মধ্যে চমৎকার ঘুমোতে শুরু করেন।

৩. ঘুমের জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর হচ্ছে মদ বা মাদক দ্রব্য। মাত্র এক পেগ অ্যালকোহলই ঘুমের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তর 'স্বপ্ন স্তর'কে নষ্ট করে দেয় এবং গভীরতর স্তর 'ডেল্টা নিদ্রা'কে নস্যাৎ করে। তাই বিশেষজ্ঞরা বলেন, ঘুমানোর আগে অ্যালকোহল পান করা প্রাথমিকভাবে ঘুমের সহায়ক হলেও এটি নিদ্রাভ্যাসের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিসাধন করে। তাই গভীর নিদ্রা ও তরতাজা অনুভূতি নিয়ে জেগে ওঠার জন্যে অ্যালকোহল পুরোপুরি বর্জনীয়।

৪. ঘুমানো ও জেগে ওঠার একটা রুটিন তৈরি করে নিন। অর্থাৎ প্রতিদিন একই সময় ঘুমোতে যান এবং একই সময়ে জেগে উঠুন।

৫. প্রতিদিন নিয়মিত ব্যায়াম করুন। নিয়মিত ব্যায়াম ও কায়িক শ্রম ঘুমের গভীর স্তর ডেল্টা নিদ্রার পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। ব্যায়াম এবং হাঁটা সব সময়ই উপকারী। তবে রাতের ঘুমের জন্য রাতের খাবারের আগে বা পরে আধাঘন্টা হাঁটা খুবই উপকারী।

৬. রাতের খাবারটা হালকা হওয়া ঘুমের জন্য অত্যন্ত উপকারী। রাতে ভূরিভোজন গভীর নিদ্রার পথে সবসময় অন্তরায় হিসাবে কাজ করে। তাই রাতে এক গ্লাস দুধ বা এককাপ দই, একটা রুটি বা একটু সবজি খাওয়া উত্তম। এ ধরনের হালকা খাবার ঘুমের জন্য সহায়ক।

৭. ঘুমোতে যাওয়ার আগে বিছানায় শুয়ে শিথিলায়ন গভীর নিদ্রার জন্য অত্যন্ত উপকারী। কয়েকবার নাক দিয়ে লম্বা দম নিয়ে মুখ দিয়ে ছাড়ুন। শরীরটাকে শিথিল করে নিন। দেখবেন সহজেই ঘুমিয়ে পড়ছেন। এজন্যে আপনি কোয়ান্টাম মেথড প্রক্রিয়ায় রাতে বিছানায় শুয়ে শিথিলায়ন করতে পারেন।

৮. সকালে ঘুম ভাঙলে চট করে উঠে পড়ুন। আলস্য ত্যাগ করে রাস্তায় হাঁটতে নেমে পড়ুন। ভোরের হাওয়া আপনার সমস্ত অবসাদ ও ক্লান্তি মুহূর্তে দূর করে দেয়।

৯. ঘুম ভাঙার সাথে সাথে আপনি শিথিলায়ন করে আপনার আলস্যকে দূর করতে পারেন। বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে নাক দিয়ে লম্বা দম নিয়ে মুখ দিয়ে ছাড়ুন। কয়েকবার এইভাবে দম নিয়ে দম ছাড়ুন। অনুভব করুন আপনার শরীর প্রাকৃতিক প্রাণে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মনে মনে অটোসাজেশন দিন: আমার দেহমন প্রকৃতির প্রাণ প্রবাহে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, আমার শরীর তরতাজা ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে, আমি এখন পূর্ণ উদ্যমে দিনের কাজ শুরু করব। তারপর চোখ মেলে আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসুন। এবং খালি হাতে কয়েকটি হালকা ব্যায়াম করুন। দেখবেন আপনি চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন।

১০. সকালের নাস্তা রাজার মত করে করুন। পাশ্চাত্য ধরনের টোস্ট বিস্কুট আর চা দিয়ে নাস্তা করার ফ্যাশন বাদ দিন। অত্যন্ত পুষ্টি সমৃদ্ধ ও উচ্চ প্রোটিনযুক্ত নাস্তা সারা সকাল আপনাকে প্রাণবন্ত ও কর্মক্ষম রাখবে, আপনার মধ্যে এক ধরনের পরিতৃপ্তি সৃষ্টি করবে। তাই সকালের নাস্তায় ডিম, মাখন, দুধ, পনির, মাছ, গোস্ত অর্থাৎ প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবারের প্রাচুর্য থাকা উচিত।

সকালে তরতাজা অনুভূতি নিয়ে ঘুম থেকে উঠা ও কাজ শুরু করার জন্য উপরের প্রক্রিয়াগুলো বহুলপরীক্ষিত। আর সকালে আপনি বেগমান ও প্রাণবন্ত হতে পারলে দিনের কাজগুলো সম্পন্ন করতে পারবেন সহজেই।

ব্যক্তিত্ব উন্নয়নে ৬টি পদক্ষেপ

আমরা সব সময় নিজেকে অন্যের চেয়ে বুদ্ধিমান, যোগ্য ও শ্রেষ্ঠ হিসেবে তুলে ধরার জন্যে সচেষ্ট থাকি। কারণ বর্তমান যুগ হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগ, প্রতিযোগিতার যুগ। নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে না পারলে আপনি অন্যদের পেছনে পড়ে যাচ্ছেন। এই প্রচেষ্টায় আপনি কখনও কখনও সফল হচ্ছেন, হাততালি পাচ্ছেন, ফুলের মালা পাচ্ছেন, আনন্দে আপনার বক্ষ স্ফীত হচ্ছে, চেহারা উজ্জ্বল হচ্ছে। কিন্তু রাতে যখন বিছানায় একা ঘুমুতে যাচ্ছেন, নিজেকে নিয়ে যখন একান্তে ভাবছেন তখন আপনি নিজেও স্বীকার করবেন যে আপনার নিজেরও ব্যক্তিত্ব উন্নয়নের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। অনেক গুণ আছে যা আপনি কাজে লাগাননি, অনেক কৌশল রয়েছে যা আপনি আয়ত্ত করতে পারেননি। মেধার অনেক ক্ষেত্রকে বিকশিত করতে পারেননি। তাই নিজের উন্নয়নের সুযোগও রয়েছে। এর ফলে আমরা প্রতিদিন বিকশিত হওয়ার চেষ্টা করি, আমরা পরিবর্তিত হই। আর এই পরিবর্তনের লক্ষ্য সব সময় থাকে আরও ভাল মানুষ হওয়ার। প্রতিদিনই আমরা চাই আমাদের ব্যক্তিত্ব আরও আকর্ষণীয় হোক, আরও সুন্দর হোক, প্রভাব বলয় আরও বাড়ুক। আমরা আমাদের ভুল ভ্রান্তিগুলো কাটিয়ে উঠতে পারলেই আমাদের ব্যক্তিত্ব আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন বা আত্ম-উন্নয়নের জন্য আমরা কিছু ছোটখাট কর্মসূচী বা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি, যা আমাদেরকে উন্নত মানবে রূপান্তরিত করবে।

১. লক্ষ্যস্থির করুন: আমরা প্রতি নিয়তই কিছু কাজ করতে চাই। আমরা মনে করি যে এই কাজগুলো করতে হবে। কিন্তু দেখা যায় যে সে কাজগুলো করা হয় না, জমতে থাকে। যেমন চিঠি লিখব কিন্তু লেখা হয় না। ব্যায়াম করে ওজন কমাব, তাও করা হয় না। কিছু প্রয়োজনীয় কাজ যা করা দরকার, তাও জমে থাকে। এই কাজগুলো যেন জমে থাকতেই ভালবাসে, অথবা আমাদের মধ্যেই এমন আলস্য রয়েছে যা কাজকে পিছিয়ে দেয়। হয়তো আমরা ব্যস্ত অথবা ক্লান্ত বা সময় মত কাজটি করতে মন চাচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে আমাদের আসল সমস্যা হচ্ছে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভাব। তাই কাজ করার আগে আমাদের লক্ষ্যস্থির করতে হবে।

লক্ষ্য সব সময় মানসিক প্রেরণা যোগায়, আপনার শক্তিকে বাড়িয়ে দেয়। তবে গবেষকরা দেখেছেন যে লক্ষ্য যদি খুব ভাসা ভাসা হয় তাহলে তা আদৌ কার্যকরী হয় না। আর বাস্তবতার সাথে লক্ষ্যের সঙ্গতি না থাকলে তাও ফলপ্রসূ হয় না। আমরা অনেক সময় অবাস্তব, অসম্ভব লক্ষ্যস্থির করি। যে সময়ের মধ্যে যে কাজ করা সম্ভব নয় অনেক সময় আমরা সেই সময়ের মধ্যে সেই কাজগুলো করার সিদ্ধান্ত নিয়ে বসি। পরিণামে সে কাজগুলো করা হয় না। তাই লক্ষ্যস্থির করার আগে আপনাকে নিশ্চিত হতে হবে যে আপনার লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট, চ্যালেঞ্জমূলক কিন্তু অর্জনযোগ্য। আর এ লক্ষ্য অর্জনের সুনির্দিষ্ট সময় সীমা রয়েছে। তাহলেই আপনি তা বাস্তবে রূপদান করতে পারবেন। আপনার কার্য প্রণালীর মধ্যে একটু বৈচিত্র্য নিয়ে এলে নিজেকে লক্ষ্যভিসারী রাখা সহজ হবে। আপনার রুটিনের মাঝে ছোটখাট পরিবর্তন কাজের উদ্দীপনা বাড়িয়ে দেবে। যেমন ভিন্ন পথে কর্মস্থলে যাওয়া, নতুন মানুষের সাথে পরিচিত হওয়া, নতুন কিছু কাজ সৃষ্টি করা।

যখন কোন কাজ একেবারে নিরানন্দ মনে হয় এ রকম একঘেয়েমিপূর্ণ কাজ

সম্পন্ন করতে পারার জন্য নিজেকে পুরস্কৃত করুন। সে পুরস্কার যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন।

২. নিজের সম্পর্কে উন্নত ধারণা সৃষ্টি করুন: আপনি নিজেকে যখন পছন্দ করতে শুরু করবেন তখনই আপনি আত্মবিশ্বাসী ও সৃজনশীল হয়ে উঠবেন। চেহারায় প্রশান্তি আসবে, বুক টান টান করে হাঁটতে চাইবেন। কণ্ঠস্বরে বলিষ্ঠতা আসবে। দৈনন্দিন কাজের বাধাগুলো আপনার কাছে সহনীয় মনে হবে। তাই নিজের সম্পর্কে ধারণাকে উন্নত করার জন্য আপনাকে সচেষ্ট থাকতে হবে। আপনার কাজের প্রশংসাসূচক চিঠি, নোট, যে কোন প্রশংসাপত্র, মানপত্র, সার্টিফিকেট এগুলোকে সযত্নে একটি ফাইলে রেখে দিন। কোন কারণে কখনও হতাশা সৃষ্টি হলে বা মন খারাপ লাগলে এই কাগজগুলোর দিকে তাকান। উল্টান। আপনি উদ্দীপনা ফিরে পাবেন।

যোগ্যতাগুলোকে বেশি করে কাজে লাগান। গুণগুলোকে যত বিকশিত করবেন, দোষ তত ঢাকা পড়ে যাবে। যখন সময় পাবেন তখন দোষগুলো নিয়ে ভাববেন। নিজের সীমাবদ্ধতা নিয়ে চিন্তা করে রাতের ঘুম নষ্ট করার কোন প্রয়োজন নেই।

নেতিবাচক চিন্তাকে পুরোপুরি বাদ দিন। নিজের কাজ করার ক্ষমতা ও শক্তি সম্পর্কে বেশি করে ভাবুন। প্রয়োজনে আপনি কি কি পারেন তার লিস্ট তৈরি করুন। যখনই কাউকে অভিনন্দিত করার সুযোগ পান তাকে অভিনন্দন জানান। আপনার অভিনন্দন তাকে খুশি করার সাথে সাথে আপনার মধ্যেও আনন্দের সঞ্চার করবে। প্রয়োজনে ঝুঁকি নিতে শিখুন। ঠাণ্ডা মাথায় হিসেব করে ঝুঁকি নিতে না পারলে বড় কিছু করা যায় না। ঝুঁকিতে যে সব সময় আপনি জয়ী হবেন তা নয় তবে ঝুঁকি নিয়ে হেরে গেলেও আপনি তা থেকে শিখতে পারছেন।

প্রয়োজনে নিজেকে নতুন ভাবে উপস্থাপিত করুন। চেহারায় কিছু পরিবর্তন, গোঁফ, দাড়ি বা চুলের নতুন বিন্যাস, নতুন পোশাক পরিচ্ছদ এমন কি জুতোয় নতুন করে পলিস লাগিয়ে আপনার ব্যক্তিত্বের প্রকাশকে উন্নত করতে পারেন।

৩. সময়মত কাজ করুন: হাতে সময় থাকতেই কাজ শুরু করুন। যারা দেরিতে কাজ শুরু করে তারা এক অর্থে অত্যন্ত আশাবাদী। তারা মনে করেন দেরিতে করলেও ঠিক সময়ে কাজ শেষ করতে পারবেন। বুঝতে পারে না, অন্যরা এই দেরি করাটাকে কখনও ভাল চোখে দেখে না। কোথাও দেরিতে উপস্থিত হওয়া অন্যদের মনে নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে। তাই সব সময় সময়মত হাজির হোন। সময়ানুবর্তী হওয়ার জন্য ঘড়ির কাঁটা পাঁচ মিনিট এগিয়ে রেখে কোন লাভ হয় না। বরং সময়মত কোথাও পৌঁছাতে হলে হেঁটে রওনা দিলে যে সময় লাগবে তার পনেরো মিনিট আগে রওনা দিন। আর যানবাহনে করে যেতে হলে কমপক্ষে আধ ঘণ্টা সময় হাতে রাখুন। তা হলে জ্যামে আটকা পড়লেও আপনি সময়মত হাজির হতে পারবেন।

সময় বাঁচানোর জন্য আপনার কর্মদিবসগুলোতে এক ঘণ্টা কম ঘুমান। ঘুম থেকে প্রতি কর্মদিবসে এক ঘণ্টা বাঁচাতে পারলে বছর শেষে আপনি দেখবেন পুরো একটা মাস পেয়ে যাচ্ছেন। আর এই অতিরিক্ত একটি কর্মমাস যোগ করতে পারায় আপনি আপনার অনেক অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে পারবেন। আর অহেতুক রাত জেগে কাজ করার চেষ্টা করবেন না। কারণ অধিকাংশ মানুষের বেলায় সকালেই তার কর্মক্ষমতা বেশি থাকে।

সবকিছু নিখুঁত ভাবে করার চেষ্টাও এক অর্থহীন প্রচেষ্টা। বেশিরভাগ সময়

নিখুঁতভাবে করতে গিয়ে আমরা দেরি করে ফেলি। তাই আপনার কাজ যদি আশি ভাগ নিখুঁত আর বিশ ভাগ মোটামুটি হয় তাহলেই আপনি উতরে গেলেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আপনি অন্যদের চেয়ে এগিয়ে গেলেন।

সময় মত কাজ শেষ করতে হলে অহেতুক টেলিফোন ও অবাঞ্ছিত দর্শনার্থীর হাত থেকে নিজেকে কৌশলে রক্ষা করুন। অবাঞ্ছিত দর্শনার্থী হলে আপনি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ুন। সরাসরি তাকে প্রশ্ন করুন যে, আমি আপনার কি উপকারে আসতে পারি? সরাসরি প্রসঙ্গে চলে যান। দাঁড়িয়েই আলাপ শেষ করে তাকে বিদায় দিন। অহেতুক ভদ্রতার খাতিরে খোশগল্পে গিয়ে নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট করবেন না। অপ্রয়োজনীয় টেলিফোনের জবাব দেয়ার জন্যে দিনের সবচেয়ে অফলপ্রসূ সময় বেছে নিন, যেমন দুপুরের খাবারের আগে অথবা বিকেলে অফিস যাওয়ার আগে এই জবাবী টেলিফোন করতে পারেন।

৪. ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করুন: ক্রোধ অনেক সময়ই প্রবঞ্চিত হওয়া বা অসহায়ত্বের অনুভূতির প্রকাশ ঘটায়। আমরা উত্তেজিত হয়ে উঠি, উত্তেজনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাই কিন্তু উত্তেজনাকে নিয়ে কি করব তা বুঝতে পারি না। আপনি ক্রোধের কারণগুলো খুঁজে বের করুন। সে কারণগুলোকে দূর করার জন্য বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করুন, দেখবেন রাগ উত্তেজনা কমে গেছে।

৫. পড়াশুনা করুন: পড়াশুনা করুন জীবনের জন্যে আত্মনির্মাণ ও আত্মআবিষ্কারের জন্যে। আত্মনির্মাণ ও আত্মউন্নয়নমূলক বই পড়ুন। শরীর-স্বাস্থ্য, খাবার, ব্যায়াম ইত্যাদি বিষয়ক প্রয়োজনীয় বইপত্র সংগ্রহ করে পড়ুন। সফল মানুষদের জীবনী গ্রন্থসমূহ সংগ্রহ করে পড়ার সাথে সাথে চিরায়ত সাহিত্য কর্মের মাঝে অবসর সময়ে নিজেকে ডুবিয়ে রাখুন। জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানই আপনার চলার পথকে সহজ করতে পারে।

৬. মেডিটেশন করুন: নিজের ভেতরে ডুব দেয়া ছাড়া নিজের সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করা যায় না। তাই প্রতি রাতে শোয়ার আগে বিছানায় গিয়ে চুপচাপ বসুন। ধ্যানের প্রক্রিয়ায় নিজের দেহমনকে প্রশান্ত করুন। নিজের সারাদিনের কাজের পর্যালোচনা করুন। ভুলগুলোর জন্যে নিজের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিন। ভাল কাজের জন্যে নিজেকে ধন্যবাদ দিন। নিজের যোগ্যতার প্রতি নতুনভাবে বিশ্বাস স্থাপন করুন। তারপর ঘুমিয়ে পড়ুন।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আবার ধ্যানে বসুন। সারা দিনের কাজের পরিকল্পনা করুন। নতুন বিশ্বাসে নতুন দিনের কাজ শুরু করুন। আপনার ব্যক্তিত্ব যেমন উন্নত হবে তেমনি আপনি ধীরে ধীরে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে আরোহণ করবেন।

দীর্ঘসূত্রিতা এড়ানোর উপায়

আজ করব, কাল করব, সকালে করব, বিকেলে করব। এই করি করি করে করা আর হয় না। আর করা হলেও হয় শেষ মুহূর্তে তাড়াহুড়ো করে। ধীরে সুস্থে ভালভাবে করার জন্যে কাজটি রেখে দিলেও শেষ মুহূর্তে তাড়াহুড়ো করে করতে গিয়ে দেখা যায় যে দায়সারা ভাবে কাজটি শেষ করতে হয়। অথচ আমরা একটু সচেষ্ট হলেই এই দীর্ঘসূত্রিতা কাটিয়ে উঠতে পারি। জীবনকে করে তুলতে পারি আরও সফল, আরও আনন্দময়।

কিন্তু কেন আমরা দীর্ঘসূত্রিতা কাটিয়ে উঠতে পারি না এই ব্যাপারে মনোবিজ্ঞানী ড. লিন্ডা সাপাদিন দীর্ঘ গবেষণা করেছেন। তিনি সব ধরনের দীর্ঘসূত্রিতার পেছনেই তিনটি সাধারণ অনুভূতি বা আচরণ সনাক্ত করেছেন। ১. আমরা বড় বড় কাজ করতে চাই কিন্তু সে লক্ষ্যে বাস্তবে কাজ শুরু করি না। ২. কাজ শুরু না করার ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে আমরা মেধাবী। ৩. আমরা জানি যে, দীর্ঘসূত্রিতা দ্বারা আমরা আমাদের সুখকে স্যাবোটাজ করছি। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই অনুশোচনা দীর্ঘসূত্রিতাকেই আরও বাড়িয়ে দেয়। আমাদের জীবন আত্ম পরাজয়ের দিকে ধাবিত হয়। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে দীর্ঘসূত্রিতার মূল কারণ আলস্য নয়। দীর্ঘসূত্রিতার প্রধান কারণ হচ্ছে এক অজানা আশঙ্কা। এই আশঙ্কা বা ভয় হতে পারে পরিবর্তনের ভয়, নিয়ন্ত্রণ হারানোর ভয়, অশান্তির ভয় বা অন্য কোন ভয়—যার অস্তিত্ব রয়েছে আপনার মনের গহীনে। আর দীর্ঘসূত্রী মানুষ সবসময় পিছনে পড়ে থাকে। অন্যরা যখন সাফল্যের সোপানে ধাপে ধাপে এগিয়ে যায়, সে তখন পেছন থেকে দেখে আর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। দীর্ঘসূত্রিতার প্রধান ধরন ৬টি।

১. স্বপ্নচারী: এরা সবসময় চায় জীবন সহজ হোক, কষ্ট মুক্ত হোক। এরা বাস্তব জীবন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে। নিজেকে আকাশ কুসুম কল্পনার মাঝে ডুবিয়ে দেয়। আকাশ কুসুম কল্পনার মাঝে ডুবে থাকতেই ভালবাসে। কারণ সেখানে কোন কিছুই তাদের জন্যে হুমকি নয়। তারা মনে করে তারা বিশেষ প্রজাতির মানুষ। তাদের নিয়ম অনুসরণ করার কোন প্রয়োজন নেই। এই ধরনের স্বপ্নাচারী দৃষ্টিভঙ্গি তাদের পেশাগত, পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক সমস্যা সৃষ্টি করে। যা পরিণামে তার মধ্যে এক পলায়নী মনোবৃত্তি জন্ম দেয়।

প্রতিকার: আপনি যদি এ ধরনের স্বপ্নাচারী হন, তা হলে 'মুহূর্তের ভাললাগা' আর 'নিজেকে ভাললাগা' এর মধ্যে পার্থক্য করতে শিখুন। আপনি যদি এখন দিবাস্বপ্নে ডুবে থাকেন, বা টেলিভিশনের সামনে বসে অলস সময় কাটান, তাহলে এটা হচ্ছে 'মুহূর্তের ভাললাগা'। কিন্তু আপনি যদি নতুন কিছু শেখেন, নতুন কোন বিষয়ে দক্ষতা অর্জনে সময় ব্যয় করেন, তাহলে আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে, নিজের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়বে। এটা হচ্ছে 'নিজেকে ভাললাগা'। কাজটা এখনই করতে হবে এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই আপনাকে নামতে হবে। বাস্তবতার আলোকে প্রতিদিন কি কি করা যায় এবং তা করার জন্যে কি কি সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেয়া যায়, তা লিখে ফেলুন। দিনের শেষে কিছুটা সময় ব্যয় করুন দিনের কাজ পর্যালোচনায়। বারবার নিজেকে বলুন, আজকের কাজ আজকেই করব।

২. দুশ্চিন্তাকারী: দুশ্চিন্তাকারীরা সব সময় নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তাকেই সবচেয়ে বেশি

গুরুত্ব দেয়। আর এজন্যে তাকে মূল্যও দিতে হয় অনেক। তার নিরাপদ ও আরামদায়ক এলাকার সীমানা খুবই ছোট। কোন ঝুঁকি বা পরিবর্তনের মুখোমুখি হলেই দুশ্চিন্তায় তার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। ঝর্ণাধারার মত অবিরাম গতিতে দুশ্চিন্তার প্রবাহ চলতে থাকে তার মনের ভেতরে। 'যদি এই এই হয়' তাহলে কি অবস্থা দাঁড়াবে এই নেতিবাচক আশঙ্কায় সে একেবারে সঙ্কুচিত হয়ে যায়। যদি এই বিরক্তিকর চাকরিটা ছেড়ে দেই, আর কোন চাকরি না পাই? এই আশঙ্কায় সে চাকরি ছাড়তে পারে না। অনিশ্চয়তা মোকাবিলা করার চেয়ে সে একঘেয়ে নিরাপদ জীবনকেই বেছে নেয়। সাধারণত দেখা যায়, এই ধরনের দুশ্চিন্তাকারীদের বাবা-মা বা অভিভাবক রয়েছেন, যাঁরা এদের প্রতিটি প্রয়োজন পূরণে এগিয়ে আসেন এবং অবচেতনভাবে তাদের সন্তান যে তাদেরকে ছাড়া চলতে পারে না এই অনুভূতিতে আনন্দ পান। দুশ্চিন্তাকারীদের জীবনে আনন্দ খুবই কম থাকে। তারা সহজেই ক্লান্ত হয়ে যায়।

প্রতিকার: অধিকাংশ দুশ্চিন্তাকারীর অন্তরেই ঘুমিয়ে আছে প্রাণবন্ত সাহসী সত্তা। আপনি যদি একঘেয়েমিতে আক্রান্ত হয়ে থাকেন, যদি কিছুই ভাল না লাগে, তাহলে আপনাকে বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সব কিছুর মধ্যেই বিপদ কল্পনা করা থেকে বিরত থাকুন। সিদ্ধান্ত নিন। কারণ সিদ্ধান্ত নেয়া থেকে বিরত থাকাও এক ধরনের সিদ্ধান্ত। আর তা নিজের জন্যেই ক্ষতিকর। নতুন পরিস্থিতি ও পরিবেশ সম্পর্কে শুধুমাত্র খারাপ দিকগুলো না ভেবে সম্ভাবনাগুলো নিয়ে ভাবুন। ভাল দিকগুলো নিয়ে ভাবলে অনুভূতিই পাল্টে যাবে। আপনি নতুন সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন। নতুন কাজে হাত দেয়ার সাহস পাবেন।

৩. অমান্যকারী: কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার বিরুদ্ধে এদের ক্ষোভ রয়েছে। কিন্তু এরা এই ক্ষোভ প্রকাশ করে খুবই সংগোপনে। এই ধরনের দীর্ঘসূত্রিতাকারী কাউকে যদি বলেন, 'এ কাজটা করে দাও।' সে সাথে সাথে বলবে 'ঠিক আছে, করে দেব।' কিন্তু তারপর সে তার প্রতিজ্ঞার কথা 'ভুলে যাবে' অথবা আধাআধি কাজটি করবে বা অনেক দেরিতে কাজটি করবে। ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এরা অন্যের প্রয়োজন পূরণের বেলায় এই একই কৌশল অবলম্বন করে। এ ধরনের আচরণ তাকে ক্ষমতার অনুভূতি প্রদান করে। কিন্তু এর ফলে তার সহকর্মী বা সঙ্গীরা নিজেদের অবহেলিত ও ব্যবহৃত ভাবে। পরিণামে অমান্যকারী নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পরও সে নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দেয় যে, এই জটিল বিশ্বে একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ বলেই সে শাস্তি পাচ্ছে। সে অসুখী হলেও এ নিয়ে গর্বিত।

প্রতিকার: প্রতিক্রিয়ার বদলে ক্রিয়া করতে শিখুন। নিজেকে জীবনের শিকার বলে মনে করার পরিবর্তে জীবনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে ভাবুন। অন্যরা আপনার ব্যাপারে কি করছে সে দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আপনি নিজের জন্যে কি করছেন তা নিয়ে ভাবুন। মনে রাখুন নিজে উদ্যোগী হওয়া ও প্রো-অ্যাকটিভ হওয়াই শক্তিমান ও ক্ষমতাবান হওয়ার প্রথম শর্ত।

৪. সঙ্কট সৃষ্টিকারী: আমরা অধিকাংশই কোন না কোনভাবে শেষ মুহূর্তে কাজ ভাল করতে পারি। হাতে আর সময় নেই, এখন না করলেই নয়, তখন আমাদের মস্তিষ্ক পূর্ণোদ্দমে কাজ শুরু করে। আমরা কাজ শেষ করি। একজন সঙ্কট সৃষ্টিকারী সবসময় নাটক করতে চায়। এক ধরনের আচরণ থেকে অন্য ধরনের আচরণে চলে যায়। প্রথমত সে পরিস্থিতিকে আমল দেয় না। চাপ অনুভব না করলে শুরুই করতে পারে না। পরে অতিরিক্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে। সব বাদ দিয়ে সময়মত কাজ শেষ

করার জন্যে লেগে যায়। এ ধরনের প্রক্রিয়া তারুণ্যে চলে। কিন্তু ৪০-এর পর এ প্রক্রিয়ার সাথে শরীর তাল মিলাতে পারে না।

প্রতিকার: সময়সীমার মধ্যে কাজ করা বীরত্বব্যঞ্জক কিছু নয়, এটি নিয়ম। 'সঙ্কট সৃষ্টি' করে কাজ করাটা একমাত্র প্রক্রিয়া নয়। সঙ্কটসৃষ্টিকারীদের কাজের ব্যাপারে নিজেকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে সমস্যায় ভোগেন। নিজেকে পুরোপুরি উদ্বুদ্ধ করতে পারলে আগে থেকেই কাজে হাত দেয়া যায়।

৫. নিখুঁত কর্মসম্পাদনকারী: এরা প্রতিটি কাজই নিখুঁতভাবে করতে চায়। যে কোন কাজ করতে গেলেই সে তার আত্মমর্যাদাকে এর সাথে জড়িয়ে ফেলে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এরা আদর্শবাদী এবং সময় ও শক্তি ব্যয়ের ব্যাপারে অবাস্তববাদী। ওদের কাউকে পেন্সিল চোখা করে দিতে বলুন। দেখবেন সে হয়তো খুব বিব্রত ভাবে পেন্সিলের দিকে তাকাবে এবং সারা দিনই হয়তো এর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাববে কিভাবে সুন্দর করে পেন্সিলটি চোখা করা যায়। অথবা সে তখনই পেন্সিল চোখা করতে লেগে যাবে এবং দিনের শেষে পেন্সিল সত্যিকার অর্থেই সুন্দর চোখা করে নিয়ে আসবে কিন্তু কাটতে কাটতে এত ছোট করে নিয়ে এসেছে যে তা দিয়ে আপনি আর লিখতে পারবেন না। এরা প্রতিটি জিনিসকেই হয় একেবারে নিখুঁত অথবা কিছুই না এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে। কোন কাজে ব্যর্থ হলে তারা নিজেদেরকেই ব্যর্থ ভাবে। নিখুঁত কর্মসম্পাদনকারীরা মনের গভীরে সবসময় মনে করে পুরোপুরি না পারলেই শেষ হয়ে গেলাম। দীর্ঘসূত্রিতা এদের কাছে বিচারকে বিলম্বিত করারই এক প্রক্রিয়া, আপনি না খেললে কখনও হারবেন না। কাজ না করলে ব্যর্থও হবেন না।

প্রতিকার: আপনার দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। আপনার কি করা উচিত তা না ভেবে আপনি কতটুকু করতে পারেন তা নিয়ে ভাবুন। কোন মানুষই নিখুঁত নয়। তাই কোন কাজই নিখুঁত হতে পারে না। আপনার মাঝে মাঝে ভুল করা উচিত। টেবিলের ওপর আধাবেলা সব এলোমেলো করে রাখুন। পোশাকে একটু খুঁত থাকুক না এক বেলা। যখন দেখবেন এর ফলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে না তখনই আপনি শিখবেন—নিখুঁত নয়, সুন্দরভাবে সময়মত কাজ করাটাই গুরুত্বপূর্ণ।

৬. সব কাজের কাজী: সব কাজের কাজীকে কখনও দীর্ঘসূত্রী মনে হয় না। কারণ সে সবসময় ব্যস্ত। সবসময় কাজ করতে চায়। সে সবাইকে খুশি করতে চায়। সবার কাজ করে দিতে চায়। কাউকেই না বলতে পারে না। সব কাজের কাজীকে আপাতদৃষ্টিতে দেখে মনে হয়, সেই সফল হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। আত্মনির্ভরশীল হওয়া ও সব কাজ করার সংগ্রামে সে তার কাজ ও সময়ের মধ্যে সমন্বয় করতে ব্যর্থ হয়। যাদের সে খুশি করতে চেয়েছিল, তাদেরকেও সে খুশি করার জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে, তাদেরও খুশি করতে পারে না। কারণ সে তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত কাজ হাতে নিয়েছিল।

প্রতিকার: সব কাজের কাজীদের উচিত না বলতে শেখা। হাতে সময় ও কাজ কতটা আছে সেটা বিবেচনা করে হ্যাঁ বলুন। এ সপ্তাহে করতে না পারলে আগামী সপ্তাহে আসতে বলুন। যতটুকু আপনি করতে পারবেন ততটুকুই করুন। বাকিটুকু ছেড়ে দিন অন্যদের জন্যে। তা হলেই আপনি সুখী হবেন। অন্যরাও আনন্দ পাবে।

আপনি এবার চিন্তা করুন এ ৬ ধরনের দীর্ঘসূত্রীর মধ্যে আপনি কোন গ্রুপে পড়েন। সেভাবে পদক্ষেপ নিন। দীর্ঘসূত্রিতা থেকে মুক্ত হয়ে সুন্দর জীবনের পথে অগ্রসর হোন।

সময়ানুবর্তী হোন

আত্মনির্মাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হচ্ছে সময় নিয়ন্ত্রণ বা সময়ানুবর্তিতা। নিজের সময় নিজের নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পারলে সময়ের যেমন অপচয় হবে তেমনি আপনার মেধার বিকাশও ব্যাহত হবে। সাফল্যের সম্ভাবনাও একইভাবে বিনষ্ট হবে। কারণ যে সময় অপচয় হলো আপনার জীবন থেকে, দিনের যতটুকু অংশই আপনি অহেতুক নষ্ট করলেন, তা কোনদিনই ফিরে পাবেন না। ফলে যে সময় নষ্ট হলো তার জন্যে অনুশোচনা করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না।

যে সমাজের মানুষ যত বেশি সফল, যে সমাজ যত বেশি অগ্রসর সেখানে সময়ানুবর্তিতা তত বেশি লক্ষণীয়। আমাদের মত অনগ্রসর সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের যে কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট বা অনুষ্ঠানে দেরি করে আসা একটা ফ্যাশানে পরিণত হয়েছে। যিনি যত বেশি গুরুত্বপূর্ণ তিনি তত দেরি করে অনুষ্ঠানে পৌঁছে নিজের গুরুত্ব জাহির করতে চান। ভিআইপি হলে তো কথাই নেই। মন্ত্রীরা মনে করেন তাঁরা তো দেরি করে যাবেনই, লোকজন তাঁদের জন্যে অপেক্ষা করবেই। অতএব এক ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা, কখনও কখনও দু'ঘণ্টা দেরিতে পৌঁছেও দুঃখ প্রকাশ করারও সামান্যতম সৌজন্য তাঁরা প্রদর্শন করেন না। এভাবেই দেরি করে অনুষ্ঠান বা আলোচনা শুরু করা বা দেরিতে কোথাও হাজির হওয়া আমাদের কাছে একটা স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। আমাদের মত অনগ্রসর অন্যান্য দেশগুলোতেও একই অবস্থা। আফ্রিকার দেশগুলোতে কোনকিছু বিলম্বে শুরু করা স্বাভাবিক ব্যাপার হিসেবে গণ্য করা হয়। সময়কে সেখানে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করা হয় না। আমাদের দেশের মতই সামাজিক, রাজনৈতিক, ব্যবসায়িক কোন অনুষ্ঠান বা আলোচনা নির্দিষ্ট সময়ে শুরু বা শেষ হয় না। যখন শুরু হলো তখন থেকেই শুরু হয়েছে বলে ধরা হয়, এক নির্বিকার শ্লথ গতিতে সবকিছু চলতে থাকে, যখন শেষ হয় তখনই শেষ হলো বলে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ, সময়ের কোন ধরাবাঁধা বন্ধন এখানে অচল। আমাদের দেশে তো প্রবাদই আছে, 'খাওয়ার আগে, দরবারের শেষে'। কিন্তু অগ্রসর দেশগুলো, যারা পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করছে তারা সব সময় সময়ের ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ। সময়ানুবর্তিতা তাদের প্রাত্যহিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। দেরিতে উপস্থিত হওয়ার সেখানে অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার। আমাদের এখানে অনুষ্ঠানে এক ঘণ্টা দেরিতে পৌঁছেও মন্ত্রীরা লজ্জিত হন না। কিন্তু জাপানে কোন মন্ত্রী অনুষ্ঠানে সামান্যমাত্র বিলম্বে পৌঁছলেও সেটা একটা খবরে পরিণত হয়।

আমরা তাই নির্দ্বিধায় বলতে পারি, সময়ানুবর্তিতা হচ্ছে অগ্রসর মানসিকতার প্রতীক। আর সময়ের প্রতি গুরুত্ব না দেয়াটা অনগ্রসরতা ও মূর্খতার প্রতীক। তাই আত্মনির্মাণ করতে হলে সফল হতে হলে আপনাকে প্রতিটি কাজে সময়ানুবর্তী হতে হবে। আপনার সময়কে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে হবে।

আপনার যদি দেরি করে ফেলার বদঅভ্যাস থেকে থাকে তাহলে নিচের ৬টি ছোট্ট পদক্ষেপ আপনাকে সময়ানুবর্তী করে তুলতে পারে।

১. কোন বন্ধু বা সহযোগীকে আপনার সহযোগী সময়রক্ষক নিযুক্ত করুন। সময়ানুবর্তী হতে তাঁর সাহায্য নিতে কোন সঙ্কোচ করবেন না। আর আপনি দেরি করে ফেলায় বন্ধু বা সহযোগীদের কি অসুবিধা হলো তা তাঁদের বলতে উদ্বুদ্ধ করুন।

২. সময় কিভাবে প্রবাহিত হচ্ছে সে সম্পর্কে যদি আপনার খেয়াল কম থাকে তা হলে একটি 'বীপার ওয়াচ' কিনুন। প্রতি ঘণ্টায় একটি মিষ্টি ধ্বনি দিয়ে সময়

সম্পর্কে ঘড়ি আপনাকে সজাগ করে দেবে।

৩. দেরি এড়ানোর জন্য কিছু অতিরিক্ত সময় হাতে রাখুন। অজুহাত প্রদানের সুযোগের উপর আস্থা রাখবেন না। ট্রাফিক জ্যামের অজুহাত কোন অজুহাতই নয়, কারণ এখন ট্রাফিক জ্যাম নৈমিত্তিক ব্যাপার।

৪. নিজেকে পুরস্কৃত করুন। সপ্তাহে তিনবার যদি সময়ের আগেই নির্দিষ্ট কর্মস্থলে পৌঁছাতে পারেন তাহলে নিজেকে পুরস্কৃত করুন। নিজের জন্য কিছু একটা কিনুন, নিজেকে ধন্যবাদ দিন। আর দেরি করার জন্য নিজেকে শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা করুন। যেমন রেস্তোরাঁয় খাবার দাওয়াতে পৌঁছতে ১৫ মিনিটের চেয়ে বেশি দেরি করে ফেললে খাবারের বিল নিজে দিয়ে দিন অথবা বাথরুমে ১৫ বার কান ধরে উঠ-বস করুন।

৫. ঘড়ির কাঁটাকে এগিয়ে রাখুন। ঘড়ি ৫/১০ মিনিট এগোনো থাকলে সময়মত কাজ সম্পাদন সহজতর হতে পারে।

৬. দেরি করার জন্যে কোন অজুহাত দাঁড় করাবেন না। সাধারণত দেখা যায়, কর্মস্থলে দেরিতে পৌঁছার পিছনে অবচেতন মনে এক ধরনের বিশেষ ভাবনা কাজ করে—যেমন, 'সবাই তো দেরিতে আসে, আমিও না হয় দেরি করলাম,' কিংবা 'কালকে একটু বেশি সময় কাজ করেছি, আজকে না হয় একটু দেরিতেই গলাম,' অথবা 'একদিন দেরিতে গেলে কী আর ক্ষতি হবে!' এ ধরনের অজুহাত বা যৌক্তিকতায় আপনি নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। কারণ আপনার জীবন থেকে যে সময় নষ্ট হয়ে গেল তা আর ফেরত আসবে না। আর দেরি করার যে বদঅভ্যাস সৃষ্টি হলো তা আপনার অগ্রগতিকেই রুদ্ধ করবে। কর্মস্থলে আপনি ঊর্ধ্বতনদের চোখে দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রতিপন্ন হবেন।

নিজের জীবনকে সময়ানুবর্তী করে তুলে সাফল্যের পথে অগ্রসর হওয়ার এক মোক্ষম পন্থা হচ্ছে নিয়মিত মেডিটেশনে অটোসাজেশন প্রদান। মেডিটেশনে মনের বাড়িতে গিয়ে প্রতিদিন বলুন: 'আজ দিনের প্রতিটি কাজ আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি কাজ আমি সময়মত করব। প্রতিটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট রক্ষায় সময়ানুবর্তী হব।'

আর বন্ধুদের, পরিচিতদের বা সহযোগীদের সময়ানুবর্তী করে তোলার জন্য আপনি নিম্নোক্ত ৬টি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

১. তাদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিন। তাদের ডাকুন। সময়ানুবর্তী হতে বাধ্য করুন। তারা নিয়মিত দেরি করায় আপনি কেন ক্ষুব্ধ হচ্ছেন তা তাদের বুঝিয়ে দিন।

২. বেশি বিনয়ী হবেন না। কোন বন্ধু বা সহযোগী পেশাগত বা ব্যবসায়িক অ্যাপয়েন্টমেন্টে পুনরায় দেরি করলে তাদের নিঃসঙ্কোচে বলুন যে আপনি দেরি পছন্দ করেন না। এবং এই বলার কারণে যদি তারা অস্বস্তি বোধ করে, করতে দিন।

৩. খাওয়ার আমন্ত্রণে কোন মেহমান যদি অস্বাভাবিক দেরি করেন বা দেরিতে আসা যদি তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়ে থাকে তা হলে তাঁর জন্য অপেক্ষা করবেন না। আপনি আহারপর্ব শুরু করে দিন।

৪. কেউ দেরিতে আসার কোন অজুহাত দিলে তা শোনার প্রয়োজন নেই। তাকে সরাসরি বলে দিন, এই কারণ শুনতে গিয়ে আরও সময়ের অপচয় হচ্ছে।

৫. অপেক্ষা করার জন্যে এমন জায়গা বেছে নিন যেখানে আপনি অপেক্ষা করতে অস্বস্তি বোধ করবেন না। রেস্তোরাঁয় বসে অপেক্ষা করার চেয়ে বইয়ের দোকানে গিয়ে বইয়ের উপর চোখ বুলানো অনেক বেশি স্বস্তিদায়ক।

৬. কেউ দেরি করলে আপনি অপেক্ষা না করে চলে যান। এই চলে যাওয়ার ফলেই আপনার অনুভূতি সে সহজেই বুঝতে পারবে।

নিজে সময়ানুবর্তী হওয়া ও অন্যকে সময়ানুবর্তী হতে বাধ্য করার জন্য এই পদক্ষেপগুলোই হচ্ছে পরীক্ষিত পন্থা।

সময়কে কাজে লাগান

দৈনন্দিন জীবনে সময়কে বোঝার জন্য আইনস্টাইন হওয়ার প্রয়োজন নেই। আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব দৈনন্দিন জীবনে তেমন কোন গুরুত্ব বহন করে না। সময়ের ব্যাপারে সার্বজনীন মূলনীতি হচ্ছে প্রতিদিন আমাদের প্রত্যেকের জন্যই সমপরিমাণ ঘণ্টা ও মিনিট বরাদ্দ রয়েছে। এই ঘণ্টা ও মিনিটগুলোকে আপনি জমা রাখতে পারবেন না, অন্য কারও সাথে বিনিময়ও করতে পারবেন না। সময় অত্যন্ত মূল্যবান। কিন্তু এ মূল্যের সাথে টাকাপয়সার মূল্যের পার্থক্য রয়েছে। টাকাপয়সা সঞ্চয় করা যায়, ধার দেয়া যায়। প্রয়োজনে ধার নেয়া যায়। কিন্তু সময় ধারও দেয়া যায় না, ধার নেয়াও যায় না। যে সময় চলে গেল তা আর কখনও ফেরত আসে না। সময় আর অর্থের ব্যাপারে একটি মৌলিক সত্য হলো দুটোই আমাদের খুব বেশি প্রয়োজন। এত বেশি প্রয়োজন যে সে চাহিদা সহজে পূরণ হওয়ার নয়। প্রায় সবাই আমরা মনে করি আরও অর্থ পাওয়া গেলে ভাল হত। আরও একটু সময় যদি পাওয়া যেত তাহলে কাজটা সুন্দরভাবে করা যেত। সময়ের অভাবের কারণে কাজ সুচারুরূপে করা যায় না। পরিবারকে নিয়ে আনন্দ-উল্লাসে মেতে ওঠা যায় না, নিজেকে নিয়ে যে নিমগ্ন থাকব তাও হয়ে ওঠে না। আমাদের এই প্রজন্মের মাঝেই সময়ের অভাবজনিত হাহাকার সবচেয়ে বেশি।

হাহাকার যতই থাকুক এই ব্যাপারে সময় ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে গেলে আপনার জীবন এত বেশি যান্ত্রিক হয়ে উঠবে যে আপনি হাঁপিয়ে উঠবেন। আপনি স্ট্রেস বা মানসিক চাপে আক্রান্ত হবেন। অত্যন্ত নিখুঁত ব্যক্তিগত কর্ম নির্ঘণ্ট আপনার উদ্বেগকেই শুধু বাড়িয়ে দেবে। কর্ম নির্ঘণ্ট অনুসারে কিভাবে চলতে হয় তার অনেক প্রণালী বা তরীকা আমরা জানি। আমরা এখন দেখব আমাদের সব প্রয়োজন কিভাবে পূরণ করতে পারি। নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য সময়ের উপর আপনার নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

নিম্নের প্রণালীগুলো অনুসরণ করলে সময়ের উপর কর্মতালিকার নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে আপনার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রয়োজন নিরূপণ করুন তারপর অর্জনের চেষ্টা করুন: সময় বাঁচানোর প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কর্মতালিকা প্রণয়ন। প্রতি মুহূর্তেই হাজারটি ভিন্ন ধরনের কাজ করা যেতে পারে। কিন্তু এই মুহূর্তে কোন কাজটি বিশেষভাবে করা প্রয়োজন তা নিরূপণ করতে পারা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

সুপারম্যানের ধারণা ত্যাগ করুন: আমরা সবকিছুই নিখুঁত সুন্দরভাবে করতে চাই। আর বড় কিছু করার তাড়না আমাদের স্নায়ুর উপর এক অবর্ণনীয় চাপ সৃষ্টি করে। তবে বড় কিছু করতে চাওয়া ও বড় কিছু করা এর মধ্যে অনেক তফাত রয়েছে। বড় কিছু করতে গেলে ছোটখাট অনেক কিছুকে এড়িয়ে যেতে হয়।

বিশৃঙ্খলা কাটিয়ে উঠুন: কাজের ঝামেলা কমানোর জন্যে আপনার জমে থাকা কাজগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করে ফেলুন। একটি হচ্ছে জরুরী আরেকটি হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। জরুরী গ্রুপে অনেক তুচ্ছ বিষয়ও থাকতে পারে। যেমন বসের চিৎকার, টেলিফোনের ঘণ্টাধ্বনি এ ধরনের ব্যাপার। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, তুচ্ছ বিষয় নিয়েই আমরা বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ি। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর প্রতি মন দিলে দীর্ঘস্থায়ী সুফল পাওয়া যায় এবং সময়ও অনেক বেঁচে যায়।

দীর্ঘস্থায়ী লক্ষ্যের জন্য সময় বাঁচান: সব সময় দেখবেন জরুরী কাজ করতে করতে সময় পার হয়ে যাচ্ছে। মুহূর্তের প্রয়োজন পূরণ করার পর দূরপ্রসারী কাজের জন্যে সময় পাওয়া যাচ্ছে না। দূরপ্রসারী লক্ষ্যের জন্যে প্রতিদিন আধঘণ্টা থেকে একঘণ্টা সময় ব্যয় করুন।

পরবর্তী জীবনে দেখবেন এই আধঘণ্টা-একঘণ্টা সময়ই আপনাকে বড় ধরনের তৃপ্তি দিচ্ছে।

সংখ্যার ভিত্তিতে অগ্রাধিকার ঠিক করুন: আপনার যা যা করা প্রয়োজন তার তালিকা প্রস্তুত করুন। তারপর গুরুত্বের ভিত্তিতে এক থেকে দশ পর্যন্ত নম্বর দিন। এক হচ্ছে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ, আর দশ হচ্ছে সর্বনিম্ন। এরপর তালিকার প্রতিটি বিষয়কে জরুরী ভিত্তিক নাম্বার দিন। এক হচ্ছে সবচেয়ে জরুরী, আর তিন হচ্ছে অপেক্ষাকৃত কম জরুরী। এরপর গুরুত্ব ও জরুরী এই দুই-এর সংখ্যাকে পূরণ করুন। যে কাজের সংখ্যা সবচেয়ে কম তাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী বলে বিবেচনা করুন।

অগ্রাধিকার নিরূপণের কৌশল: অগ্রাধিকার নিরূপণের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হচ্ছে প্রতিদিন দিনের কর্মতালিকা প্রস্তুত করা। সারাদিন কি করতে হবে লিখে ফেলুন। তারপর সবচেয়ে জরুরী কাজগুলোর পাশে 'ক' চিহ্ন দিন। এরপর এই কাজটি করতে কত সময় লাগতে পারে তা অনুমান করে দেখুন। যদি দেখেন সবগুলো কাজ করতে আট ঘণ্টারও বেশি সময় লেগে যাচ্ছে তাহলে তালিকা সংক্ষেপ করুন। সারাদিন তালিকা অনুসারে কাজগুলো করতে চেষ্টা করুন।

গুছিয়ে কাজ করুন: আমাদের অনেকেই অগোছাল অবস্থায় কাজ করি। এতে সময় লাগে বেশি। একটু সচেতনভাবে গুছিয়ে কাজ করলে সময় ও অর্থ দুইই বাঁচানো যায়।

টেবিল গোছানো ও কাজের চাপ কমানোর জন্যে যে কাজগুলো আপনার অধীনস্থরা করতে পারে সেই কাগজপত্রগুলোর উপর তাদের নাম লিখে সরাসরি তাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। নিজের টেবিলে যে কাজগুলো শুধু আপনি নিজেই করবেন সেই কাগজপত্রগুলো রাখুন। অপ্রয়োজনীয় কাগজে টেবিল জাম করে রাখবেন না। গবেষণায় দেখা গেছে আপনার টেবিলে আসা কাগজপত্রের মাত্র ২০ থেকে ৪০ ভাগ প্রয়োজনীয় কাগজ। ৬০ ভাগ কাগজই অপ্রয়োজনীয়। আর যে কাগজগুলো আপনি ফাইল করে রাখছেন তার মাত্র ৫ থেকে ১০ ভাগ আপনার কাজে আসবে। তাই অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র নির্দ্বিধায় ফেলে দিন।

সময়ের অপচয় রোধ করুন: আমাদের যে সময় নেই তা নয়, আসলে আমাদের মনে হয় আমরা খুব ব্যস্ত। কিন্তু মূল্যবান সময়ের একটা বিরাট অংশ অপচয় হয়, এটা ঠিক। আমাদের অজ্ঞাতসারেই অনেক সময় অহেতুক নষ্ট হয়ে যায়। এই নষ্ট সময়কে বাঁচাতে পারলেও দিনে একাধিক কর্মঘণ্টা যোগ করা সম্ভব।

অনাহূত দর্শনার্থী ও ফোন: আমাদের দিনের ৫০ থেকে ৬০ ভাগ সময় অনাহূত দর্শনার্থীর সঙ্গে ও টেলিফোনে খোসালাপ করতে গিয়ে নষ্ট হয়ে যায়। এরকম অনাহূত দর্শনার্থী অফিসে আপনার কক্ষে প্রবেশ করার সাথে সাথে আপনি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে যান। 'কেমন আছেন?' জিজ্ঞেস করার পরিবর্তে একটু হেসে জিজ্ঞেস করুন, 'আমি আপনার জন্যে কি করতে পারি?' অফিসকক্ষে দেয়ালে একটি বড় ঘড়ি রাখুন, যাতে করে আপনি প্রয়োজন বোধে ঘড়ির দিকে তাকাতে পারেন। তাহলে আপনি দেখবেন যে, আলাপ অহেতুক দীর্ঘায়িত হচ্ছে না।

কাউকে টেলিফোন করলে তাকে খুঁজে, ডেকে আনতে বলে টেলিফোন ধরে রেখে অহেতুক সময় নষ্ট করবেন না। বরং খবর দিয়ে রাখুন যে আপনি আবার একটি নির্দিষ্ট সময়ে টেলিফোন করবেন। কাউকে রিংব্যাক করতে বললেও নির্দিষ্ট

সময়ে রিংব্যাক করতে বলুন। টেলিফোনে আলাপ যাতে দীর্ঘায়িত না হয় সেজন্যে কাউকে অফিসে টেলিফোন করলে লাঞ্চের কিছুক্ষণ আগে অথবা অফিস ছুটির কিছুক্ষণ আগে করুন।

বোকার মত আমরা অনেক সময় কাজ করার প্রস্তুতি নিতেই প্রচুর সময় ব্যয় করে ফেলি। যেমন কাজ শুরু করার আগে এক কাপ চা বা কফি খেয়ে মানসিক প্রস্তুতি নেয়া বা কোন টেলিফোন করার আগে পত্রিকার পাতায় চোখ বুলিয়ে নেয়া। এ সব প্রস্তুতি বাদ দিয়ে সরাসরি কাজে বসে যান এবং সেরে ফেলুন। কাজ শেষ করে নিজেকে চা বা কফি দ্বারা পুরস্কৃত করুন।

এই ছোট ছোট পদক্ষেপগুলো নিয়ে আপনি মূল্যবান সময় বাঁচাতে পারেন। দীর্ঘসূত্রিতার হাত থেকে রেহাই পেতে পারেন। সময় যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা আসলে আমরা বুঝি না। আধুনিক সভ্যতাই যে শুধু সময়কে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেছে তা নয়, পবিত্র কোরআন শরীফেও সুরা আর রহমান-এ সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'কুল্লো ইয়াওমিন হুয়া ফিস্‌শান। ফাবি আইয়্যে আলায়ে রাব্বি ক্যুমা তুকাজ্জিবান।' অর্থাৎ 'সময়ের প্রতিটি মুহূর্তেই আমার মহিমা নব নব রূপে দীপ্যমান। তুমি আমার কোন দানকে অস্বীকার করবে?' বস্তুত, সময়ের অপচয় করা নিজের অজ্ঞাতসারে স্রষ্টার দান ও মহিমাকে অবহেলা করারই শামিল।

সফল হওয়ার সহজ পথ

সফল হতে হলে সাফল্যের সাথে নিজেকে চিহ্নিত করতে হবে। সফল হওয়ার সহজ পথ এটাই। প্রাকৃতিক নিয়ম হচ্ছে, মনোশক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করলে মনই কাঙ্ক্ষিত বস্তুর দিকে আমাদের নিয়ে যাবে, এই প্রাকৃতিক নিয়মকে বুঝতে পারলে, এই নিয়মকে সুনির্দিষ্টভাবে ব্যবহার করতে পারলে অগ্রগতির আকস্মিকতা ও দ্রুততা হবে বিস্ময়কর। এক অদৃশ্য শক্তি নিশ্চিতভাবেই আমাদের সাফল্যের পথে ঠেলে নিয়ে যেতে থাকে। সাফল্যের জন্যে সৃষ্টি হয় প্রয়োজনীয় অখণ্ড মনোযোগ। সাফল্য হয়ে ওঠে সুনিশ্চিত।

এই স্বতঃস্ফূর্ত সাফল্যকে আকর্ষণ করার জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে মনছবি। বিশ্বাসযুক্ত সৃজনশীল কল্পনার নামই হচ্ছে মনছবি। আসলে ইচ্ছাশক্তি নয়, মনছবিই সাফল্য সৃষ্টি করে। ইচ্ছাশক্তি হচ্ছে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হাতিয়ার। ইচ্ছাশক্তি হচ্ছে কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে চিন্তা ও কাজকে নিয়ন্ত্রিত করার সচেতন ক্ষমতা। কিন্তু মনছবি ছাড়া ইচ্ছাশক্তি বেশিদূর এগুতে পারে না। আসলে অন্তর্চেতনাই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য দিয়ে ইচ্ছাশক্তিকে জোরদার করে। আর এই অন্তর্চেতনা প্রচণ্ড শক্তি অর্জন করে মনছবি দ্বারা।

তাই সফল হতে হলে সবচেয়ে আগে প্রয়োজন হচ্ছে মনছবি। অর্থাৎ যে লক্ষ্য আপনি অর্জন করতে চান, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ধারণা ও বিশ্বাস সৃষ্টি করতে হবে। লক্ষ্যের সাথে নিজেকে পুরোপুরি একাত্ম করতে হবে। অন্তরে লক্ষ্যকে সব সময় প্রজ্বলিত রাখতে হবে। আমাদের সমগ্র কল্পনা, চিন্তা ও অনুভূতিকে এই লক্ষ্যের সাথে একাত্ম করতে হবে। অর্থাৎ মানসিকভাবে নিজেকে সাফল্যের সাথে সনাক্ত করতে হবে।

সফল হওয়ার জন্যে সাফল্যের সাথে নিজেকে সনাক্ত করার জন্যে মনছবি করার পরই প্রয়োজন সাফল্যের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করা। অর্থাৎ সাফল্য গ্রহণ করার উপযুক্ততা অর্জনে নিজেকে পুরোপুরি সাফল্যের হাতিয়ারে রূপান্তরিত করতে প্রস্তুত হতে হবে। যা পেতে চান নিজেকে তা পাওয়ার যোগ্য করার জন্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনীয় কাজ ও মনোযোগ প্রদানে নিজের ইচ্ছাশক্তিকে ব্যবহার করতে হবে।

মনছবি যত দূরবর্তী বা যত কঠিন হোক না কেন আপনি যদি আপনার মনকে লক্ষ্যের জন্যে প্রস্তুত করতে পারেন এবং সফল প্রয়াসকে সেই লক্ষ্যে নিবেদিত করতে পারেন, আপনি সফল হবেনই। সাফল্যের প্রাকৃতিক নিয়মেই আপনি ক্রমান্বয়ে বিকশিত হবেন।

সাফল্যের ফুল সব সময় প্রাকৃতিক নিয়মেই ক্রমান্বয়ে প্রস্ফুটিত হয়। একটি ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায় আরেকটি ধাপের দিকে। তাই আপনাকে প্রো-অ্যাকটিভ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শুরু করতে হবে। যেখানে আছেন সেখান থেকেই শুরু করতে হবে। ধাপে ধাপে এগিয়ে যাবেন মনছবির চূড়ান্ত লক্ষ্য পানে। আপনি প্রথম কাজটি প্রথম করলেই আপনার অচেতন মন পরবর্তী ধাপে করণীয় সম্পর্কে সচেতন মনে তথ্য ও উদ্দীপনা প্রেরণ করবে। তবে চূড়ান্ত লক্ষ্যের মনছবিকে সব সময় মনের সামনে রাখতে হবে এবং সে পর্যায়ে নিজেকে উত্তীর্ণ করার জন্যে প্রয়োজনীয় গুণ, অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা অর্জনের প্রতিটি সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে প্রতিটি সফল মানুষ নিজের জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে

এই প্রাকৃতিক নিয়মকেই কাজে লাগিয়েছেন।

মনছবির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি অন্তরায় আমরা নিজেরাই সৃষ্টি করি। বড় চিন্তা করতে গিয়ে, সুদূর প্রসারী লক্ষ্যস্থির করতে গিয়ে ছোট ছোট কাজ, ছোট ছোট পথের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি না। আমরা বুঝতে পারি না ছোট ছোট ইঁটই হচ্ছে বিশাল ভবনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সামগ্রী, পায়ে চলা পথই গিয়ে মেশে রাজপথে, ছোট ঝর্ণাই নদী হয়ে পৌঁছে যায় বিশাল মহাসমুদ্রে। প্রতিদিনের ছোট ছোট কাজ প্রতিদিন সমাপ্ত করলে মাস-বছর-যুগ শেষে তাই পরিণত হয় বিশাল সাফল্যে।

আমরা যদি শতাব্দী প্রাচীন বট গাছের দিকে তাকাই, তাহলে এর ডাল-পালা-কাণ্ড-মূল আমাদের মোহিত করে। কিন্তু যে বীজ থেকে এই মহীরুহ সৃষ্টি হয়েছে, সে কথা একবার ভাবুন। একটি বট গাছের ফল কাকের পেটে গিয়ে বিষ্ঠা আকারে এই মাটিতে পতিত হয়েছিল বীজটি। দিন, মাস বছর পার হয়ে বিষ্ঠার মাঝে নির্গত ছোট বীজটিই দিগন্ত আচ্ছন্নকারী শতাব্দীর মহীরুহে পরিণত হয়েছে। আসলে জন্মগ্রহণ করেই কেউ সফল হয় না, সিঁড়ি বেয়েই একজন ধাপে ধাপে সাফল্যের শীর্ষ বিন্দুতে পৌঁছায়। আসলে বাস্তবতার আগে প্রয়োজন ধারণার। ধারণার সাথে বিশ্বাস, একাগ্রতা ও দৃঢ়তা যুক্ত হয়েই সাফল্য আসে।

এই মহা প্রকৃতিতে মানুষই সফল হয়, স্মরণীয় হয়, বরণীয় হয়। কারণ মানুষের রয়েছে চেতনা রূপী এক মহাশক্তিশালী চালিকা শক্তি। আর ব্যক্তি চেতনা বিশ্বজনীন মহাচেতনারই একটি ক্ষুদ্র অংশ। ব্যক্তি যেমন চেতনা দ্বারা পরিচালিত, মহাবিশ্বের সবকিছু পরিচালিত হচ্ছে মহাচেতনার দ্বারা। সৎ, মঙ্গল ও কল্যাণ চিন্তার সাথে সাথে আমাদের চেতনায় নতুন শক্তি সঞ্চারিত হয় মহাচেতনা থেকে। মহাচেতনা তখন হয়ে ওঠে আমাদের নীরব সহযোগী। এই প্রাকৃতিক আইন ও নীরব সহযোগী সম্পর্কে সচেতনতা আপনার সাফল্যের সবচেয়ে বড় ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে।

টেনশনপ্রুফ জীবনের জন্যে ১০টি ধাপ

আমরা জানি, মন আমাদের অসুস্থ করে তুলতে পারে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, আমাদের ভয়, সন্দেহ, প্রতিক্রিয়া ও সংস্কার থেকে বেশির ভাগ রোগের জন্ম হয়। মানসিক চাপ, টেনশন, দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা মোকাবিলার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া দ্বারাই নির্ধারিত হয় শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের অবস্থা। আবার মন দ্বারাই নির্ধারিত হয় কি অসুখে আমরা আক্রান্ত হব এবং কতদিন বেঁচে থাকব। অবশ্য মন যেমন আমাদের রোগব্যাধি ও মৃত্যুর কারণ হতে পারে, তেমনি তা নিরাময়, প্রশান্তি ও সুস্বাস্থ্যের মাধ্যমও হতে পারে।

ডা. ভেরনন কোলম্যান মনের শক্তির উপর দীর্ঘ গবেষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমরা যদি আমাদের আবেগ এবং প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখতে পারি তাহলে মন আমাদের দেহের বিপক্ষে নয় বরং দেহের পক্ষে এক প্রচণ্ড শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। তিনি বলেছেন, মনের শক্তিকে বাস্তব ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রয়োগ করে আমরা আমাদের শরীরকে টেনশনপ্রুফ করে তুলতে পারি।

মনের শক্তি প্রয়োগ করে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখা ও দেহকে টেনশনপ্রুফ করে তোলার জন্যে নিম্নোক্ত দশটি ধাপ অত্যন্ত ফলপ্রসূ হতে পারে।

১. আত্মবিশ্বাস তৈরি করুন: আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকলে আপনি ক্রমান্বয়ে টেনশনে আক্রান্ত হবেন। নিজের উপরে যদি আস্থা না থাকে তাহলে অন্যদের দাবি ও প্রত্যাশার মুখে নিজেকে অসহায় মনে হবে। আর আপনি সহজেই টেনশনজনিত রোগে আক্রান্ত হবেন। আত্মবিশ্বাসহীনতা কাটিয়ে ওঠার জন্যে নিজের শক্তির উপর বেশি করে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। এর একটি সুন্দর উপায় বলে দিচ্ছি। কাগজ-কলম নিয়ে বসে নিজেকে একজন বিজ্ঞাপনলেখক হিসেবে কল্পনা করুন। মনে করুন, আপনি একটি পণ্য এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের কাছে এই পণ্য বিক্রি করতে হবে। তাই নিজের সম্পর্কে বলতে পারেন এমন ভাল ভাল সকল কথা চিন্তা করুন। আর নিজের যা যা গুণ রয়েছে সব এক এক করে লিখুন। গুণাবলী লেখার সময় নিজের কিছু কিছু গুণকে একটু অতিরঞ্জিত করে ফেলুন, কারণ সব বিজ্ঞাপনেই তা করা হয়। নিজের দুর্বলতার কথা যা আপনি ভাল করেই জানেন তা নতুন করে দেখার কোন প্রয়োজনই নেই। নিজের গুণাবলীর তালিকা বারবার পড়ুন।

২. 'না' বলতে শিখুন: অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, যারা সবসময় অন্যকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করে, অন্যে কি মনে করবে না করবে তা ভাবে, তারা বেশি টেনশনে ভোগে। আর যারা নিজের ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকে গুরুত্ব দেয় তাদের টেনশন তুলনামূলকভাবে কম। তাই বলে নিষ্ঠুর বা অভদ্র হওয়ার প্রয়োজন নেই। আপনার শুধু নিজের প্রয়োজন এবং ইচ্ছা সম্পর্কে আরও সজাগ হওয়া দরকার। এবং আপনি যা পছন্দ করেন সে ব্যাপারে আপনার সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকা উচিত। নিজের জন্যে দৃঢ় হতে শিখুন। আপনি যখন সত্যি সত্যি কিছু একটা করতে চান না তখন বিনয়ের সাথে 'না' বলুন। আপনি অনুভব করবেন, এই 'না' বলতে পারায় আপনি স্বস্তি পেয়েছেন এবং আপনার টেনশন কমে গেছে। আর যাকে 'না' বললেন তিনিও দেখবেন ব্যাপারটিকে সহজভাবে নিয়েছেন। যা করবেন না কখনোই তা করবেন বলবেন না। কারণ করব করব বলে দীর্ঘসূত্রিতা আপনার যেমন টেনশনের কারণ হবে, তেমনি অন্য পক্ষেরও তা বিরক্তির উদ্রেক করবে।

৩. জীবনের লক্ষ্যস্থির করুন: বেঁচে থাকার জন্যে আমাদের দরকার কিছু প্রত্যাশা, অর্জন করার জন্যে কিছু লক্ষ্য, দেখাশোনা করার মত বা লালন করার মত কোনকিছু। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছাড়া আপনার জীবন শূন্য থাকবে। উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং আশা জীবনের সকল সমস্যাকে অতিক্রম করতে সাহায্য করবে। জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য তারুণ্যে আপনার যা আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল তার একটি তালিকা তৈরি করুন। কল্পনা করুন কৈশোরে কি কি আশা ও উদ্দীপনা আপনাকে উদ্দীপিত করেছিল। এখন চিন্তা করুন সেসব স্বপ্ন ও আশার কোন্ কোন্‌টি আপনাকে এখনও উদ্দীপিত করে। আপনি অনুভব করবেন, আপনার অনেক আশা এখনও আপনার নাগালের মধ্যে। আপনি ইচ্ছে করলে, প্রচেষ্টা চালালে সেসব অর্জন করতে পারেন। আর এই নতুন আশাই আপনার জীবনের লক্ষ্যে পরিণত হতে পারে।

৪. অগ্রাধিকার নিরূপণ করুন: আপনি যদি আসল সমস্যা ও তুচ্ছ সমস্যার মধ্যে পার্থক্য করতে না পারেন, কোন্ কাজ আগে করবেন এবং কোন্‌টা পরে করবেন এবং আপনার জন্যে কোন্‌টা বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা যদি নির্ধারণ করতে না পারেন তাহলে আপনি টেনশনে আক্রান্ত হবেন। অহেতুক উৎকণ্ঠার বোঝা বাড়তে থাকবে। আপনি যদি সচেতনভাবে গুরুতর সমস্যা ও তুচ্ছ সমস্যার মধ্যে পার্থক্য স্থাপন না করেন তাহলে মন সবগুলো সমস্যাকে গুরুতর সমস্যা হিসেবে ধরে নেবে। তাছাড়া আপনি যদি তুচ্ছ জিনিস নিয়ে চিন্তা করেন তাহলে গুরুতর সমস্যা সমাধানে পিছিয়ে পড়বেন। অবশ্য সমস্যা বা কাজের অগ্রাধিকার নির্ধারণ কঠিন কিছু নয়। আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আপনার জন্যে কোনটা গুরুত্বপূর্ণ। গুরুত্বপূর্ণ নয় এমন কাজে সময় নষ্ট করা বোকামি মাত্র। আপনার জীবনে কি কি বিষয় মানসিক চাপ সৃষ্টি করছে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন। তারপর সিদ্ধান্ত নিন, বিষয়গুলোর মধ্যে কোন্‌টা আসলেই গুরুত্বপূর্ণ। তাহলেই দেখবেন, মানসিক চাপ কমে গেছে।

৫. আবেগ প্রকাশ পেতে দিন: আপনি যদি চাপা স্বভাবের হয়ে থাকেন এবং সবকিছুই নিজের মধ্যে চেপে রাখতে চান তাহলে আপনাকে আবেগ প্রকাশ করতে শিখতে হবে। আপনি যদি দুঃখ পান এবং কাঁদতে ইচ্ছে হয় তাহলে কাঁদুন, হাউমাউ করে কাঁদুন। গবেষকরা দেখেছেন আবেগজনিত কারণে চোখে যে পানি আসে সে পানির রাসায়নিক গঠন ধুলাজনিত কারণে সৃষ্ট চোখের পানির রাসায়নিক গঠন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কান্না জিনিসটি দুশ্চিন্তা ও বিষণ্নতা প্রতিরোধক। তাই কাঁদতে ইচ্ছে করলে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই—নিঃসঙ্কোচে কাঁদুন।

৬. রাগ ও ক্রোধ প্রকাশ করে ফেলুন: রাগ ও ক্রোধ প্রকাশ করে ফেলতে হবে। কারণ রাগ আপনার জন্যে দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও আর্থিক ক্ষতির কারণ হতে পারে। ক্রোধ জমিয়ে রাখলে তা আপনার ক্ষতির কারণ হতে পারে। বিশেষ পরিস্থিতিতে রাগ অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। কোন কারণে আপনার যদি রাগ হয়ে থাকে, প্রকাশ করে ফেলুন। আপনি যদি রেগে গিয়ে থাকেন, বলুন, আপনি এই কারণে রাগ করেছেন আপনার যদি মনে হয় কোন শারীরিক কার্যক্রমের মাধ্যমে রাগ প্রকাশ করা দরকার তাহলে তাই করুন। ফুটবলে জোরে একটা লাথি মারুন, দেয়ালে জোরে দু'একটা থাপ্পড়ও মারতে পারেন। কিংবা বাথরুমের কল ছেড়ে জোরে জোরে কথা বলে রাগকে কমিয়ে ফেলতে পারেন। রাগ নিজের মধ্যে পুষে রাখবেন না, যে কোন উপায়ে একে প্রকাশ করুন। আপনার ভিতরের টেনশন কমে যাবে।

৭. একঘেয়েমি দূর করুন: আমরা মনে করি, অতিব্যস্ততা ও উৎকণ্ঠা মানসিক চাপ সৃষ্টি করে। কিন্তু কর্মহীনতা ও একঘেয়েমিও' একইভাবে মানসিক চাপ ও উৎকণ্ঠার কারণ হতে পারে। আপনার যদি মনে হয় জীবন একেবারে একঘেয়ে হয়ে

উঠেছে তাহলে কিছু শখের কাজকর্ম নিয়ে মেতে উঠুন। এটি যেমন কোনকিছু সংগ্রহের কাজ হতে পারে, তেমনি হতে পারে কোন সেবামূলক তৎপরতা। আপনি ভালবাসেন এমন কিছু তৎপরতা বা অন্যের উপকার হয় এমন কোন কাজে জড়াতে পারলে আপনি নিশ্চয় গর্ব অনুভব করবেন। আর মাঝে মাঝে ঝুঁকি নিতে ভয় পাবেন না। ব্যর্থতার আশঙ্কা রয়েছে এমন কাজের ঝুঁকিও কখনও-সখনও নিতে পারেন। এতে একঘেয়েমি দূর হবে।

৮. দিনে কয়েকবার হাসুন: হাসি কিভাবে মানবদেহে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তা এখনও রহস্যাবৃত। কিন্তু হাসি দমকে স্বাভাবিক করে, রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়াকে সুন্দর রাখে, রক্তচাপ কমায় এবং অভ্যন্তরীণ নিরাময় হরমোন সরবরাহ বৃদ্ধি করে। তাই প্রতিদিন হাসার জন্যে নতুন নতুন উপলক্ষ সৃষ্টি করুন। এজন্যে প্রথমত, হাস্যোজ্জ্বল, সুখী ও রসিক লোকদের সাথে যতদূর সম্ভব সময় বেশি কাটানোর চেষ্টা করতে থাকুন। দ্বিতীয়ত, মজার মজার বই, কমিক, কার্টুন পড়ুন। এছাড়া শিশুদের সাথে কৌতুক, খেলাধুলা ও মজা করুন।

৯. জীবনের সাথে মমতাকে যুক্ত করুন: মমতা ও প্রেম এক সর্বপ্লাবী সঞ্জীবক শক্তি। যে কোন বয়সের নরনারী একটি উষ্ণ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থেকে লাভবান হতে পারেন। আমেরিকার ইনস্যুরেন্স কোম্পানিগুলো পরিসংখ্যান নিয়ে দেখেছে যে যদি কোন স্ত্রী প্রতিদিন সকালবেলা অফিসে যাওয়ার আগে স্বামীকে চুমু দিয়ে বিদায় জানায় তাহলে যাত্রাপথে স্বামীর দুর্ঘটনার আশঙ্কা অনেক কমে যায় এবং স্বামীর আয়ু গড়পড়তা পাঁচ বছর বেশি হয়ে থাকে।

কারও প্রতি মমতা বা ভালবাসা থাকলে আপনার অনুভূতিকে গোপন রাখার প্রয়োজন নেই। কাউকে ভালবাসলে তাকে সে কথা বলার মধ্যে কোন অন্যায় নেই। ঘর থেকে বেরোনোর সময় হাসিমুখে বিদায় নিন বা দিন। প্রিয়জন, বন্ধু বা সন্তান-সন্ততির প্রতি আদর, মমতা ও প্রেমের শালীন প্রকাশে কখনোই সঙ্কোচ করবেন না।

১০. মেডিটেশন করুন: টিভি বা সিনেমার পর্দার সামনে বসলেই আপনার শরীর-মন শিথিল হবে এমন কোন কথা নেই। টিভির সামনে বসে থাকা সত্ত্বেও দিনের সমস্যা ও উৎকণ্ঠা আপনার মনোলোকে বিচরণ করতে পারে। তাই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় শিথিলায়ন করুন। কল্পনাকে আপনার চিন্তা ও দেহের উপর কর্তৃত্ব করতে দিন। দরজা বন্ধ করে আধ ঘণ্টার জন্যে হাত-পা ছেড়ে কার্পেটের উপর বা শক্ত বিছানায় শুয়ে পড়ুন। লম্বা দম নিতে নিতে শরীরকে শিথিল হয়ে যেতে দিন। কল্পনাকে আপনার সবচেয়ে সুখকর স্থান বা স্মৃতিতে বিচরণ করতে দিন। প্রাকৃতিক দৃশ্যের মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলুন। পাখির কলতান শুনুন। ফুলের গন্ধ অনুভব করুন। আকাশের নীলিমা আর গাছের পাতার সবুজের বৈচিত্র্যে নিজের দৃষ্টিকে হারিয়ে ফেলুন। আপনি শিথিলায়নের গভীর স্তরে পৌঁছে যাবেন। দেহ-মন যেমন প্রশান্ত হয়ে উঠবে, তেমনি সেই অবস্থায় নিজের মনোদৈহিক উন্নয়নের জন্যে অটোসাজেশন ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারবে।

বন্ধুত্ব ধারণা ও বাস্তবতা

দুঃখ ও আনন্দের মমতাপূর্ণ ভাগীদার ছাড়া জীবন এক বিরান মরুভূমি ছাড়া কিছুই নয়। দার্শনিক এমারসন বলেছেন, একজন বন্ধু হচ্ছেন প্রকৃতির সচেয়ে বড় মাস্টারপিস। বন্ধুত্বের গুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্য কবি বা দার্শনিক হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। আপনার আনন্দ এবং দুঃখে আপনার পাশে কেউ না থাকলে আনন্দ যেমন বহুলাংশে মাটি হয়ে যায়, তেমনি দুঃখও সহজে হালকা হয় না। মানুষ যখন বেদনাভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে তখন বন্ধুর কাছ থেকে সে প্রথম সান্ত্বনা পায়, আর যখন আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে তখন এ আনন্দের খবর সে প্রথম বন্ধুকেই জানায়। বন্ধুত্বের সাথে যেহেতু আবেগের ব্যাপার জড়িত সেহেতু বন্ধুত্ব আনন্দের সাথে সাথে সমস্যারও সৃষ্টি করতে পারে। তাই বন্ধুত্বের সংজ্ঞা, বন্ধুর কাছ থেকে কতটুকু চাওয়া ও পাওয়া যেতে পারে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকলে ভুল বোঝাবুঝির বা সমস্যার পরিমাণ অনেক কমে যেতে পারে। বন্ধুত্ব কেমন হওয়া উচিত এ নিয়ে অনেক প্রচলিত ধারণা রয়েছে। এ ধারণাগুলো নিয়ে আমরা যদি একটু অলোচনা করি তাহলে দেখব বাস্তবতা আসলে ভিন্ন। ধারণা ও বাস্তবতার এ পার্থক্য পরিষ্কার হলে বন্ধুত্ব আরও স্বাভাবিক ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। বন্ধুত্ব সম্পর্কিত কয়েকটি প্রচলিত ধারণাকে বাস্তবতার আলোকে বিচার করলেই আমাদের কাছে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে। ধারণাগুলো হচ্ছে:

১. ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা একে অন্যের জীবনের সবকিছুতেই ভাগীদার হবে। সাধারণভাবে এ ধারণা প্রচলিত হলেও আধুনিক নগরজীবনে এ ধারণা বাস্তবসম্মত নয়। অধিকাংশের কর্মজীবনের বন্ধু এবং পারিবারিক বন্ধু ভিন্ন। আবার পড়শীদের সাথে যে বন্ধুত্ব তা-ও আলাদা। শখ বা আগ্রহের ভিত্তিতে যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে তা-ও আলাদা। আবার ধর্মচর্চার বেলায় দেখা যায় সম্পূর্ণ আলাদা কারোর সাথে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব এক সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ঘটনা। কারণ মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, জীবনের সব ব্যাপারেই দুই ব্যক্তির মধ্যে আগ্রহের মিল হওয়া খুব দুর্লভ ব্যাপার। এমনকি আপনার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরও এমন কিছু আগ্রহ ও শখ থাকতে পারে যেগুলোর সাথে আপনার আগ্রহের আদৌ মিল নেই। তাছাড়া সদানির্ভরযোগ্য বন্ধুত্ব কামনা, শিশুসুলভ নিরাপত্তাহীনতা-বোধেরই প্রকাশ। একজন বন্ধুর উপর পুরোপুরি নির্ভরতা অনেক সময়ই দুঃখের কারণ হতে পারে। অপর পক্ষ তার সামাজিক পরিধি বাড়ানোর চেষ্টা করলেই প্রথম পক্ষকে দুঃখবোধে পেয়ে বসতে পারে। তাই একক বন্ধুত্বের চেয়ে একাধিক বন্ধুত্ব সবসময়ই আবেগগতভাবে ভাল।

২. সত্যিকারের বন্ধুত্ব মানে আজীবন বন্ধুত্ব। এ ধারণা সব সময় ঠিক নয়। ছোটবেলায় যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, শিক্ষাজীবনে যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে, কর্মজীবনে প্রবেশ করার পর তার অধিকাংশই হারিয়ে যায়। আবার বাসস্থান পরিবর্তনের কারণেও পুরানো বন্ধুত্বের জায়গায় নতুন বন্ধুত্বের সৃষ্টি হয়। কর্মজীবী মহিলাদের বেলায় এ ব্যাপারটি আরও সুস্পষ্ট। কর্মজীবনে বা শিক্ষাজীবনে অনেকের সাথে বন্ধুত্ব হয়, কর্ম ও শিক্ষাজীবন ত্যাগ করে পুরোপুরি গৃহিণী হয়ে গেলে তখন বন্ধুত্বের আওতা পুরোপুরি পাল্টে যেতে পারে। তবে এ ধরনের খণ্ডকালীন বন্ধুত্বকেও কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করার কোন প্রয়োজন নেই। জীবনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন মানুষের সাথে প্রয়োজনীয় ও আনন্দদায়ক বন্ধুত্ব হতে পারে।

৩. বিপরীত লিঙ্গের কারও সাথে নিষ্কাম বন্ধুত্ব সম্ভব নয়। এধারণাও সবসময় সত্যি নয়। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, বিপরীত লিঙ্গের সাথে নিষ্কাম বন্ধুত্বের ঘটনাও এখন প্রায়শই দেখা যায়। কোন পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোন আগ্রহের বা উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে একটি সুন্দর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সম্ভব হতে পারে। মনোবিজ্ঞানীরা অবশ্য সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, এ ধরনের বন্ধুত্বকে কামবর্জিত রাখা কখনও কখনও বেশ কঠিন। যখন আপনি কাউকে পছন্দ করতে শুরু করেন এবং ব্যক্তি হিসাবে তার প্রতি আকৃষ্ট হন তখন তার প্রতি যৌন অনুভূতিও সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু এই অনুভূতি অনুসারে যে কাজ করতে হবে এমন কোন কথা নেই। আপনি এ অনুভূতিকে মনে মনে স্বীকার করে নিয়েও তা সীমার মধ্যে রেখে দিলে সমস্যা না-ও আসতে পারে।

৪. রক্ত পানির চেয়ে গাঢ়। বন্ধুদের চেয়ে আত্মীয়রা ঘনিষ্ঠ। এ ধারণাও সবসময় ঠিক নয়। এমনও দেখা গেছে ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের, বোনের সাথে বোনের চিন্তা-চেতনা কোন কিছুরই মিল নেই। তাদের বাবা-মা এক—এছাড়া তাদের মধ্যে আর কোন মিল পাওয়া যায় না। এমনও দেখা যায়, একজনের বিপদে ভাইবোনদের বদলে বন্ধুই এগিয়ে আসে। কারণ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে পছন্দের ভিত্তিতে। আর আত্মীয়রা একে অন্যের সাথে রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ। রক্ত পানির চেয়ে ঘন হতে পারে, কিন্তু রক্ত জমাট বেঁধে গেলে তা আঠাল হয়ে অকেজো হয়ে যায়। তাই অধিকাংশ সময় দেখা যায় বন্ধুরা বন্ধুদের যেভাবে বোঝে ও অনুভব করে আত্মীয়রা সেভাবে বোঝেও না, অনুভবও করে না।

৫. ভাল বন্ধুদের সমসাময়িক হতে হবে। এ ধারণাও সবসময় ঠিক নয়। ২৬ বছরের যুবকের সাথে ৫০ বছরের প্রৌঢ়ের বন্ধুত্ব হতে পারে। আর এ বন্ধুত্ব অত্যন্ত পরিপূরক হতে পারে। দুই প্রজন্মের মধ্যে বন্ধুত্ব উভয়ের জন্যে অতিরিক্ত কিছু সুযোগ এনে দিতে পারে। বয়স্ক বন্ধু তরুণের জন্যে জ্ঞান, বুদ্ধি, পরামর্শের উৎস হয়ে দাঁড়াতে পারে। আর তরুণের কাছ থেকে বয়স্ক পেতে পারে তারুণ্যের উদ্দীপনা।

৬. বিপদে বন্ধুর পরিচয়। অধিকাংশ সময়ই এ কথা ঠিক হতে পারে। তবে কখনও কখনও ব্যতিক্রমও দেখা যায়। বিপদে বা দুঃসময়ে যে বন্ধুর মত এগিয়ে আসে, অনেক সময় বিপদ কেটে গেলে বন্ধুত্বের সেই তীব্রতা থাকে না। কোন কোন মনোবিজ্ঞানী বলেন, দুঃসময়ের বন্ধুত্ব সুসময়েই ভেঙে যায়। কারণ সুস্থ বন্ধুত্ব দেয়া-নেয়ার উপর নির্ভরশীল। বন্ধুরা পালাক্রমে উৎসাহ, উদ্দীপনা, সহানুভূতি দেয় এবং নেয়। কিন্তু কোন কোন মানুষ সহানুভূতি দিতে চায়, নিতে চায় না। আবার কেউ কেউ অচেতনভাবে কামনা করে বন্ধু যে ভাবাবেগজনিত সমস্যা বা দুঃসময়ে পড়েছে তা অব্যাহত থাকুক যাতে সে ক্রমাগত সহানুভূতি বিলিয়ে যেতে পারে। তাই কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় বন্ধু যখন খারাপ মানসিক অবস্থা থেকে ভাল অবস্থার দিকে এগুতে শুরু করে তখন ওই 'ত্রাণকর্তা' বন্ধুটি নিজের অজ্ঞাতসারে সুপরিবর্তনকে স্যাবোটাজ করতে চেষ্টা করে। লক্ষ্য একটিই—যাতে বন্ধুত্বের ধারা অপরিবর্তনীয় থাকে।

৭. ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব বজায় রাখতে হলে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে। এ ধারণাও ঠিক নয়। বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে, বন্ধুরা অনেক দূরে থাকে। ঘন ঘন দেখা-সাক্ষাতের কোন সুযোগ নেই, দীর্ঘদিন পরে হয়তো দেখা হয়। কিন্তু দেখা হওয়ার সাথে সাথে তাদের যে অন্তরঙ্গতার প্রকাশ ঘটে তা দেখে যে কেউ মনে করতে পারে যে এরা সবসময় কাছাকাছি একসাথে আছে। যখন উভয়ে উভয়কে অনন্য মনে করে তখন দীর্ঘ বিচ্ছেদ সত্ত্বেও বন্ধুত্ব অব্যাহত থাকে।

বয়স বাড়লে নতুন বন্ধু পাওয়া যায় না। এ ধারণাও আসলে ঠিক নয়। বয়স

বাড়ার সাথে সাথে নতুন নতুন বন্ধুত্ব সৃষ্টি হতে পারে। আবার সক্রিয় কর্মজীবন সমাপ্তির পরেও চমৎকার নতুন বন্ধুত্বের সৃষ্টি হতে পারে।

বন্ধুত্ব সম্পর্কে এ ধারণা ও বাস্তবতাগুলো সামনে রাখলে এ নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা একেবারেই কমে যাবে।

মেডিটেশন কি আয়ু বাড়ায়?

মেডিটেশনে আয়ু বাড়ে। জীবন সুন্দর হয়, আনন্দময় হয়। আমাদের সাধকরা মোরাকাবা বা ধ্যানের মাধ্যমে প্রবল মানসিক শক্তি ও প্রাণবন্ত জীবনের অধিকারী হয়েছেন। তাঁদের চেহারার ঔজ্জ্বল্য, ত্বকের লাবণ্য, মানসিক বিচক্ষণতা সাধারণ মানুষকে অভিভূত করত। এখনও সাধকদের বয়স বোঝা মুশকিল। আশি বছর বয়সেও তাঁরা অনুভব করেন চল্লিশ বছরের প্রাণময়তা।

সাধকদের এই প্রাণবন্ত জীবনের ওপর আগে অলৌকিকত্ব আরোপ করা হত। কিন্তু এখন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, বৃদ্ধ বয়সেও যে কেউ মেডিটেশন করে দেহের অভ্যন্তরের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করতে পারেন, প্রাণবন্ত হতে পারেন। এ ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের এক চমৎকার সমীক্ষা প্রকাশিত হয়েছিল সাপ্তাহিক 'নিউ সায়েনটিস্ট' পত্রিকার ১৯৯০ সালের ২৮ এপ্রিল সংখ্যায়।

বিজ্ঞান বিষয়ক বস্তুনিষ্ঠ এই সাময়িকীর এই রিপোর্টে বলা হয় যে, যুক্তরাষ্ট্রের দু'দল বিজ্ঞানী দাবি করেছেন, ট্র্যান্সেন্ডেন্টাল মেডিটেশন (Transcendental Meditation বা সংক্ষেপে T. M.) আপনার আয়ু বাড়াতে পারে এবং জীবনের মান উন্নত করতে পারে। বিজ্ঞানীরা বলেন, তাঁরা দেখেছেন, বয়স্ক ব্যক্তিরা যদি শিথিলায়ন পদ্ধতি হিসেবে দিনে দু'বার ট্র্যান্সেন্ডেন্টাল মেডিটেশন করেন, তা হলে প্রাণবন্ততা বাড়ার সাথে সাথে আয়ুও বাড়বে।

রিপোর্টে বলা হয়: আইওয়ার ফেয়ারফিল্ডের মহাঋষি বিশ্ববিদ্যালয়-এর চার্লস আলেক্সান্ডার ও হাওয়ার্ড শ্যান্ডলার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের সাথে নিয়ে ৭৩টি রিটায়ারমেন্ট হোম-এর বাসিন্দাদের ওপর গবেষণা পরিচালনা করেন। হোম-এর বাসিন্দাদের গড় বয়স ছিল ৮১ বছর। তাঁরা বয়সের ওপর তিনটি শিথিলায়ন বা মেডিটেশন পদ্ধতির তুলনামূলক প্রভাব পর্যালোচনা করেন।

আলেক্সান্ডার ও তাঁর সহযোগী গবেষকরা অপরিকল্পিতভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তিনটি পদ্ধতি থেকে একটি করে মেডিটেশন বা শিথিলায়ন পদ্ধতি শিক্ষা দেন। চতুর্থ গ্রুপকে কোন শিথিলায়ন পদ্ধতি শেখানো হয়নি। অন্য তিনটি গ্রুপের সদস্যরা তাঁদের নিজ নিজ পদ্ধতিতে মেডিটেশন করতে থাকেন।

গবেষকরা তিন মাস পর এই চার গ্রুপের লোকদের অবস্থা জরিপ করেন। তাঁরা দেখতে পান, ৪টি গ্রুপের মধ্যে যাঁরা ট্র্যান্সেন্ডেন্টাল মেডিটেশন করছিলেন, তাঁদেরই সবচেয়ে বেশি উন্নতি হয়েছে। গড়ে তাঁদের সিসটোলিক রক্তচাপ ১৪০ থেকে ১২৮-এ নেমে এসেছে। এটা প্রমাণিত সত্য যে, উচ্চ রক্তচাপ নেমে এলে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমে যায়। আর হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে মৃত্যুর একটি বড় ধরনের কারণ। মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষায় আরও দেখা গেছে যে, ট্র্যান্সেন্ডেন্টাল মেডিটেশন গ্রুপের সদস্যরা অন্য গ্রুপের চেয়ে ভালভাবে চিন্তা করতে পারছেন, তাঁদের স্মরণ শক্তিরও তুলনামূলক উন্নতি বেশি।

তিন বছর পর জরিপ চালিয়ে দেখা যায় যে ট্র্যান্সেন্ডেন্টাল মেডিটেশন গ্রুপের সবাই বেঁচে আছেন। অপর পক্ষে অন্য তিনটি গ্রুপের প্রতিটি গ্রুপ থেকেই বেশ কিছু সদস্য মারা গেছেন। রিটায়ারমেন্ট হোমের ৪৭৮ জন বাসিন্দার মধ্যে যাঁদের এই গবেষণার আওতায় আনা হয়নি, এই সময় তাঁদের মৃত্যুর হার ছিল শতকরা ৬২·৫ ভাগ।

গবেষক আলেক্সান্ডার বলেন, আয়ুবৃদ্ধির ক্ষেত্রে ট্র্যান্সেন্ডেন্টাল মেডিটেশনের প্রভাব নিরূপণের ক্ষেত্রে এটিই ছিল প্রথম গবেষণা। ইতিপূর্বে এই মেডিটেশন পদ্ধতির উপর পরিচালিত অন্যান্য জরিপ ও গবেষণার সাথে এই ফলাফল অত্যন্ত সাযুজ্যপূর্ণ। অন্যান্য গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে বয়স বাড়ার সাথে সাথে অনেক মনোদৈহিক প্রক্রিয়া, যেমন রক্তচাপ, দৃষ্টিশক্তি, কগনিটিভ ফাংশনিং, ডিয়াস হরমোন (DHEAS Hormone)-এর মাত্রা ইত্যাদির অবনতি ঘটতে থাকে। কিন্তু ট্র্যান্সেন্ডেন্টাল মেডিটেশনে এই প্রক্রিয়াগুলোর উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে। উল্লেখযোগ্য যে, ডিয়াস হরমোন উৎপন্ন হয় এড্রিনাল গ্ল্যান্ডে। তারুণ্যে এই হরমোনের মাত্রা বেশি থাকে এবং বয়স বাড়ার সাথে সাথে এর মাত্রা কমতে থাকে।

রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, সাধারণভাবে ধারণা করা হয়, প্রতিটি মেডিটেশন ও শিথিলায়ন পদ্ধতি সমান কার্যকর। কিন্তু এই গবেষণা এই ধারণার প্রতি প্রত্যক্ষ চ্যালেঞ্জ। ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কেনেথ ইপলি পরিচালিত আরেকটি গবেষণা এই চ্যালেঞ্জকে আরও শক্তিশালী করেছে। কেনেথ উৎকণ্ঠা নিবারণে বিভিন্ন মেডিটেশন পদ্ধতির কার্যকারিতা সম্পর্কে ইতিপূর্বে পরিচালিত শতাধিক গবেষণা ও জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণ করেন। তিনি দেখতে পান যে, অন্য যে কোন পদ্ধতির চেয়ে ট্র্যান্সেন্ডেন্টাল মেডিটেশন দ্বিগুণ কার্যকরভাবে উৎকণ্ঠা কমিয়ে আনে।

ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত 'নিউ সায়েনটিস্ট' বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার ফলাফল প্রকাশের জন্যে বিজ্ঞানী মহলে সবচেয়ে সমাদৃত সাময়িকী। এতে প্রকাশিত এই রিপোর্ট থেকেই প্রমাণিত হয় মেডিটেশনের ব্যাপারে প্রাচ্যের পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব। উল্লেখযোগ্য যে, উপমহাদেশের বিশিষ্ট সাধক মহাঋষি মহেশযোগী ১৯৬০ সালে আমেরিকায় প্রথম ট্র্যান্সেন্ডেন্টাল মেডিটেশন বা টিএম চালু করেন। চালু হওয়ার পর থেকেই হলিউডের তারকা থেকে শুরু করে পেন্টাগনের জেনারেলরাও এই টিএম-এর প্রতি ঝুঁকে পড়েন। সেই থেকে ট্র্যান্সেন্ডেন্টাল মেডিটেশনই যুক্তরাষ্ট্রে এক নম্বর জনপ্রিয় মেডিটেশন পদ্ধতিতে পরিণত হয়। এরপর যুক্তরাষ্ট্রে অনেক মেডিটেশন পদ্ধতি চালু হয়, যেমন, ১৯৬৪ সালে সাইকোকেবারনেটিক, ১৯৬৬ সালে সিলভা মেথড ইত্যাদি। কিন্তু কার্যকারিতার দিক থেকে শতাধিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ও গবেষণায় প্রচলিত অন্য সব মেথডের চেয়ে ট্র্যান্সেন্ডেন্টাল মেডিটেশন-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে সেখানে এখনও এই পদ্ধতিই শীর্ষস্থানে রয়েছে।

'৯০-এর দশকে এসে মহাঋষির ট্র্যান্সেন্ডেন্টাল মেডিটেশনের ধারণার ওপর কোয়ান্টাম ধারণা প্রভাব বিস্তার শুরু করেছে। মহাঋষির বিশিষ্ট শিষ্য ডা. দীপক চোপড়া, এমডি, আমেরিকায় এখন কোয়ান্টাম নিরাময়ের ধারণা প্রচার করছেন। কোয়ান্টাম হিলিং-এর ওপরে এবং সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবনের ওপরে তিনি এ পর্যন্ত চারটি গবেষণামূলক বই লিখেছেন, যা আমেরিকার চিকিৎসাজগতে এক নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত তাঁর 'Ageless Body, Timeless Mind' বইটিকে তিনি অভিহিত করেছেন 'বৃদ্ধ হওয়ার কোয়ান্টাম বিকল্প' রূপে। এ বইটি ইতিমধ্যেই এক মিলিয়ন কপি বিক্রি হয়েছে এবং বেস্টসেলার তালিকায় রয়েছে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, মেডিটেশনের কার্যকারিতার পথে আপনার বয়স কোন অন্তরায় নয়। ৬০,৭০,৮০—আপনার বয়স যা-ই হোক না কেন, আপনি মেডিটেশন শুরু করে নতুন প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত হতে পারেন।

আপনিও বাঁচতে পারেন ১২০ বছর!

কতদিন বাঁচব? এ চিন্তা মাথায় আসার সাথে সাথে আমরা আমাদের বয়সের একটা সীমা নির্ধারণ করে ফেলি। আর সেই সীমা আমাদের জন্যে বাস্তবতায় পরিণত হয়।

বিজ্ঞান বর্তমানে মনে করে, দুরারোগ্য ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত না হলে আমাদের প্রত্যেকেরই ১১৫ থেকে ১২০ বছর বেঁচে থাকার জৈবিক যোগ্যতা রয়েছে। আর ব্যাপারটা যদি তা-ই হয় তবে মধ্যবয়স শুরু হওয়ার কথা ৬০ থেকে ৬৫ বছর বয়সে। কিন্তু আমরা আমাদের আয়ু অনেক কম মনে করি। ৬০ বছর বয়স হলেই জীবনের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। দেখা হলেই বলি, আর ক'দিনই বা আছি—এখন আল্লাহ-আল্লাহ করে একটু শান্তিতে মরতে পারলেই বাঁচি। আর যাঁরা কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন, তাঁরা তো রাতারাতি বৃদ্ধে পরিণত হন। ৪০-এর কোঠায়ই মহিলাদের মেনোপজ হয়ে যায়। ৪০-এর কোঠায় পুরুষরা হার্ট-অ্যাটাকের আশঙ্কা করেন। বেশির ভাগ লোক ৫০-এর কোঠায় এসে এবাদত-বন্দেগিতে মন দেয়াকেই শ্রেয় মনে করেন।

আমাদের পারিপার্শ্বিকতা, সাংস্কৃতিক ধ্যানধারণা আমাদের আয়ু সংক্রান্ত প্রত্যাশাকে নিয়ন্ত্রণ করে। আর মনোদৈহিক প্রক্রিয়ার মূল সূত্র হচ্ছে: 'প্রত্যাশা ফলাফল নিয়ন্ত্রণ করে।' এখন আপনি যদি আপনার প্রত্যাশাকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আলোকে শুধরে নেন, তাহলেই আপনি আপনার দেহকে বহুলাংশে কালজয়ী করে তুলতে পারেন।

দেহকে কালজয়ী করে তুলতে হলে আয়ু ও বয়স সম্পর্কিত কিছু সর্বজনীন ভ্রান্ত ধারণা প্রথমে দূর করতে হবে। কারণ এ ধারণাগুলো আসলেই সত্য নয়। এ ব্যাপারে মূল ভুল ধারণা হচ্ছে, বার্ধক্যের প্রক্রিয়ায়ই মানুষ মারা যায়। সত্যি কথা হচ্ছে, বার্ধক্যের সাথে সংযুক্ত জ্বরা-ব্যাধিই মৃত্যুর কারণ। অর্থাৎ, বয়স হওয়ার কারণে কেউ মারা যায় না, আর বয়স হলেই ব্যথা-যন্ত্রণা হয় না। যন্ত্রণা আসে জ্বরা-ব্যাধি থেকে। আর একটি ভ্রান্ত ধারণা হচ্ছে, আয়ু জিন-বৈশিষ্ট্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আসলে আপনার পিতামাতা যদি ৮০ বছর বেঁচে থাকেন তাহলে এই জিন-বৈশিষ্ট্য আপনার আয়ুর সাথে গড়ে মাত্র ৩টি বছর যুক্ত করতে পারে। পক্ষান্তরে আপনার ধ্যানধারণা, আচরণ-প্রক্রিয়া, খাওয়াদাওয়া ও কার্যপ্রণালী আপনার আয়ুকে ৫০ থেকে ৬০ বছর পর্যন্ত প্রলম্বিত করতে পারে। এ ক্ষেত্রে আপনি জিন-বৈশিষ্ট্যকে সাফল্যজনকভাবে অতিক্রম করতে পারেন।

বয়সের ব্যাপারে আর একটি ভ্রান্ত ধারণা হচ্ছে, বার্ধক্যের প্রক্রিয়া অপরিবর্তনীয়। প্রকৃতির দিকে তাকালে আপনি দেখবেন, এ ধারণা সত্য নয়। প্রকৃতির মধ্যেই এমন প্রক্রিয়া রয়েছে, যা কোন কোন প্রাণীকে বুড়িয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে। যেমন ব্যাকটেরিয়া ও প্রোটোজোয়ান। প্রাণীজগতের দিকে তাকালে দেখবেন, মৌমাছি বয়সকে পিছনের দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারে। আর বর্তমানে চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে মানুষ বৃদ্ধ হওয়ার শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াকে পাল্টে দিতে পারে। বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে বার্ধক্য প্রক্রিয়ার চিহ্নগুলো, যেমন, হাড়ের ঘনত্ব, শরীরের তাপমাত্রা, মেটাবলিক রেট, রক্তচাপ, পেশীর শক্তি, শরীরের চর্বির পরিমাণ ও অন্যান্য জিনিস পরিবর্তন করা যায়। ব্যায়াম, খাদ্যাভ্যাস, নির্মল আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মেডিটেশনের মাধ্যমে এগুলোতে পরিবর্তন আনা যায়।

অবশ্য মেডিটেশন অর্থ শুধু শিথিলায়ন নয়। শিথিলায়ন আমাদের বর্তমান মানসিক চাপ পীড়িত সমাজের উৎকণ্ঠা নিবারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবুও বৃহত্তর অর্থে শিথিলায়ন হচ্ছে চেতনার উচ্চস্তরে উত্তরণের প্রথম পদক্ষেপ। চেতনার এই উচ্চস্তরের সাথেই জড়িত রয়েছে অন্তর্দৃষ্টি, সৃজনশীলতা, সুকুমারবৃত্তি ও প্রজ্ঞা।

দীর্ঘ প্রশান্তিময় জীবনের জন্যে, আনন্দময় জীবনের জন্যে ব্যায়াম, খাদ্যাভ্যাস ও জীবনধারায় পরিবর্তন অত্যাবশ্যক। তবে এটা হচ্ছে গোটা বিষয়ের একটা অংশ মাত্র। এর অপর অংশ বুঝতে হলে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানীরা জগৎকে কিভাবে দেখেন তা জানতে হবে। কোয়ান্টাম মেকানিকস আমাদের বলে যে, আপাতদৃশ্যমান কঠিন বস্তু বা পদার্থ অদৃশ্য সাব-অ্যাটমিক কণা দ্বারা গঠিত। আর একেবারে আদি অবস্থায় এই কণাগুলো হচ্ছে শক্তি বা এনার্জি ও তথ্যের সংমিশ্রণ। তার অর্থ, আমাদের এই দৃশ্যমান জগৎ গঠিত হয়েছে শক্তির অদৃশ্য জগৎ ও তথ্যের সমন্বয়ে। মনের বেলায়ও এই নিয়ম প্রযোজ্য। পা চুলকাতে চাইলে আপনাকে মন থেকে তথ্য ও শক্তি ব্যবহার করতে হবে। যদিও আমরা আমাদের ধারণা, কামনা, বাসনা, প্রবৃত্তি, পছন্দ ও অপছন্দ দেখতে বা ধরতে পারি না তবুও এগুলোর বাস্তবতাকে কোন অবস্থায়ই অস্বীকার করা যায় না। আমাদের চারপাশের দৃশ্যমান জগৎ এগুলো দ্বারাই গঠিত হয়েছে। আপনি যদি এই অদৃশ্য জগতের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন তাহলে আপনার দৃশ্যমান স্পর্শগ্রাহ্য জগৎকে পরিবর্তন করতে পারেন। চিন্তা যেমন যুদ্ধ বাধাতে পারে, ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করতে পারে, ধ্বংস ডেকে আনতে পারে তেমনি চিন্তা পারে প্রেম, মমতা, শান্তি, সম্প্রীতি ও তারুণ্যময় জীবন গঠন করতে।

কালজয়ী দেহ নির্মাণের জন্যে ডা. দীপক চোপড়া তাঁর 'Ageless Body, Timeless Mind' গ্রন্থে অনেকগুলো প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে কয়েকটি হলো:

১. *জীবনের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।* এর অর্থ অন্যের ওপর ক্ষমতাবান হওয়া নয়। বরং নিজের জীবনের ব্যাপারে স্বায়ত্তশাসন লাভ। এটা করার একটা উপায় হচ্ছে অন্যের সমর্থন বা অনুমোদন লাভের প্রয়াস থেকে বিরত থাকা। কারণ অন্যকে খুশি করে অনুমোদন লাভের চেষ্টায় আমরা আমাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ শক্তিকে ক্ষয় করে ফেলি।

২. *নিজের অন্তর্গত সত্তার প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন।* সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে বাইরের সূত্রের ওপর নির্ভর না করা। প্রকৃতি প্রত্যেককেই মনীষা দিয়ে সৃষ্টি করেছে। কিন্তু আপনি যদি সবসময়ই জ্ঞান ও তথ্যের জন্যে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকেন তাহলে আপনার ভেতরের এই মনীষার মৃত্যু ঘটে। আপনার শরীর-মন সবসময়ই বলছে সে কী চায়, আপনি কান পেতে শুনলে দেখবেন সবসময় সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন।

৩. *সব ব্যাপারেই পারফেকশনিস্ট হতে যাবেন না।* খুঁতখুঁতে স্বভাব যত বর্জন করতে পারবেন তত আপনি স্বস্তি পাবেন। দীর্ঘায়ু হতে হলে আপনাকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে শিখতে হবে।

৪. *অন্তর্গত লক্ষ্য নির্ধারণ করুন।* অধিকাংশ মানুষই অর্থ, বিত্ত, খ্যাতি, ক্ষমতা, ঘৃণা বা বিদ্বেষের বন্দী হয়ে যায়। বরং জীবনকে শান্ত ও মহিমান্বিত করার চেষ্টা করুন। কাজ করুন। হাসুন। ভালবাসুন। প্রকৃতির নেপথ্য ছন্দে নিজেকে ছন্দায়িত করুন। দেখবেন বয়স বাড়লেও তারুণ্য আপনাকে ঘিরে থাকবে।

অরনিশ থেরাপি হৃদ্‌রোগ নিরাময়ে মেডিটেশন

পাশ্চাত্য বিশ্বের এক নম্বর ঘাতক ব্যাধি হৃদ্‌রোগ। হৃদ্‌রোগের মূল কারণ স্ট্রেস বা মানসিক চাপ এবং অসম খাবার ও অতিভোজন। হার্ট অ্যাটাকের সূচনা হয় হৃৎপিণ্ডে রক্ত সরবরাহকারী করোনারি ধমনীর দেয়ালে হলুদ চর্বির স্তর জমে-জমে এক সময় রক্ত চলাচল কমে এলে। এতে হার্টের জন্যে প্রয়োজনীয় রক্তের সরবরাহ কমে যায়। ঘটে অ্যানজাইনা অ্যাটাক। পঙ্গুত্ব বা মৃত্যু যেন তখন খুব কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করতে থাকে। প্রচলিত চিকিৎসাবিজ্ঞানে ধমনীর এই চর্বি পরিষ্কার করার জন্যে শক্তিশালী ওষুধ, অ্যানজিওপ্লাস্টি এবং বাইপাস সার্জারি করা হয়। ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কথা বাদ দিলেও একশ্রেণীর ডাক্তারের বিশ্বাস হচ্ছে, ধমনীতে চর্বির স্তর একবার জমা শুরু হলে আর নিস্তার নেই। যত কিছুই করা হোক না কেন, চর্বি জমবেই। তাই বাইপাস সার্জারিই উত্তম। কিন্তু বাইপাস সার্জারিতে খরচ অনেক এবং তা-ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ামুক্ত নয়। সার্জারির পর একজন মানুষের জীবনীশক্তি কার্যত অর্ধেকে এসে দাঁড়ায়।

হৃদ্‌রোগের প্রচলিত চিকিৎসাপদ্ধতি অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত রোগীদের এছাড়া কোন বিকল্প উপায় ছিল না। কিন্তু বর্তমানে ওষুধ ও অস্ত্রোপচার ছাড়াই কম অর্থব্যয়ে হৃদ্‌রোগীরা পুরোপুরি নিরাময় লাভ করছেন। হৃদ্‌রোগ নিরাময়ে এ সফল পদ্ধতির প্রবর্তক হচ্ছেন ক্যালিফোর্নিয়ার বিজ্ঞানী ডা. ডিন অরনিশ।

১৯৮৭ সালে প্রবর্তনের পর থেকে তাঁর এই পদ্ধতি এত সফল হয়েছে যে, সর্বমহলেই এটি এখন গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। ফলে এটি এখন আর বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে নেই, এটি এখন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে হৃদ্‌রোগ চিকিৎসার মূল ধারায়। মেডিটেশন, যোগব্যায়াম, নিরামিষ খাবার এবং গ্রুপ আলোচনা হচ্ছে এই পদ্ধতির ভিত্তি।

ক্যালিফোর্নিয়ার প্রিভেন্টিভ মেডিসিন রিসার্চ ইন্সটিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা ডা. ডিন অরনিশ-এর এই পদ্ধতি যে কতখানি সফল হয়েছে, তার প্রমাণ হচ্ছে, 'নিউজউইক' সাময়িকীর ১৯৯৫ সালের ২৪ জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত 'গোয়িং মেইনস্ট্রিম' রিপোর্টটি। রিপোর্টে বলা হয়:

জীবনধারণ পদ্ধতি পরিবর্তনের মাধ্যমে হৃদ্‌রোগকে শুধু প্রতিরোধ করা যায় না, নিরাময়ও করা যায়। ডা. অরনিশের এই পরিসংখ্যান ভিত্তিক তথ্য প্রকাশিত হওয়ার পর ওমাহার মিউচ্যুয়াল ইনস্যুরেন্স কোম্পানি ২ বছর আগে স্বাস্থ্য বীমার পলিসিধারী কয়েক শত হৃদ্‌রোগীকে অরনিশের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। এঁদের মধ্যে ২ শত রোগী ১৫ হাজার ডলারের অ্যানজিওপ্লাস্টি বা ৪০ হাজার ডলারের বাইপাস সার্জারির জন্যে হাসাপাতালে ভর্তি হওয়ার পরিবর্তে ৫ হাজার ডলারের এই জীবনধারা পরিবর্তন পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করেন। সারা বছরের এই কর্মসূচীতে রয়েছে মেডিটেশন, ব্যায়াম, নিরামিষ খাবার এবং গ্রুপ আলোচনা।

নিরীক্ষার শুরুতে সমালোচকরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে, রোগীরা জীবনযাত্রা পরিবর্তনমূলক এই কর্মসূচী কয়েকদিন পরেই পরিত্যাগ করবে এবং অরনিশের ফি-র ওপর আবার হাসপাতালের বিলও কোম্পানির ঘাড়ে চাপবে।

কিন্তু দেখা গেল যে, ৯৫ ভাগ রোগীই অরনিশের কর্মসূচীতে নিজেদের সম্পৃক্ত করে ফেলেছেন। ২০০ রোগীর মধ্যে ১৯০ জন এক বছরের এই কর্মসূচী অনুসরণ করেন। এর মধ্যে ১৮৯ জন সুস্থ হয়ে যান। মাত্র ১ জনের অপারেশন করার প্রয়োজন হয়। মিউচ্যুয়াল বীমা কোম্পানি হিসেব করে দেখেছেন যে, ইতিমধ্যেই তারা প্রতি ডলারে সাড়ে ৬ ডলার বাঁচিয়েছে। আর যেহেতু হৃদ্‌রোগীদের অপারেশন-পরবর্তী বছরগুলোয় বারবার অপারেশন প্রয়োজন হয়, তাই কোম্পানি মনে করে যে, অরনিশের কর্মসূচী তাদের ডলার প্রতি ২০ ডলার বাঁচাতে সাহায্য করবে। এই সাফল্য দেখে আরও ১৫টি বীমা কোম্পানি অরনিশের কার্যসূচী গ্রহণ করার চেষ্টা করছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে বিশেষজ্ঞদের পাঠানো হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়ার সাওসালিটোতে। তারা এখন জানতে চাইছে এই কর্মসূচী কিভাবে রোগীর ওপর প্রয়োগ করতে হবে। নেবেরেস্কার ৫০ বছর বয়স্ক পুলিস ফ্রাঙ্ক সেবরন অরনিশের কর্মসূচীতে যোগদান করে। এর আগে তার অ্যানজিওপ্লাস্টি করা হয়েছে এবং তাকে প্রতি মাসে ২১৪ ডলার ব্যয় করে ২টি ওষুধ খেতে হত। কিন্তু সে এত দুর্বল ছিল যে, কাঠও কাটতে পারত না। আজ তার ধমনী প্রায় পরিষ্কার। তার কোলেস্টেরলের মাত্রা একেবারে কম। সে এখন দূরপাল্লার বাইসাইকেল চালায়। হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞরা—যাঁরা সেবরনের বাঁচার আশাই ত্যাগ করেছিলেন—এখন তাকে বলেন, 'আমরা একত্রেই বুড়ো হব।'

ডা. অরনিশের এই কার্যসূচী এখন সর্বজনীনভাবে গৃহীত হয়েছে। তাই একে আর এখন বিকল্প চিকিৎসা ব্যবস্থা বলা হয় না। এটি এখন চিকিৎসার মূল ধারার সাথে সংযুক্ত হয়েছে। ওষুধ ছাড়াই হৃদ্‌রোগ চিকৎসায় ডা. অরনিশের সাফল্যের কথা বিশ্ববাসী প্রথম জানতে পারে ১৯৮৮ সালে। কিন্তু ডা. অরনিশ এ ব্যাপারে গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধান চালিয়ে আসছিলেন বহু বছর ধরে। ১৯৮৬ সালে ৪১ জন হৃদ্‌রোগীকে ২ ভাগে ভাগ করে গবেষণা শুরু হয়। এই ৪১ জনের মধ্যে কেউই করোনারি বাইপাস সার্জারি করাতে রাজি হচ্ছিলেন না। হলুদ চর্বির স্তর জমে এঁদের ধমনী প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিল। কেউ কেউ ইতিমধ্যেই হার্ট অ্যাটাকের শিকার হয়েছেন। এঁদের ২ দলে ভাগ করা হলো। প্রথম দলে ২২ জন, আর কন্ট্রোল গ্রুপে ১৯ জন।

ডা. অরনিশের মেডিটেশন ও জীবন অভ্যাস কর্মসূচী গ্রহণ করলেন ২২ জন। প্রথমে এঁরা মিলিত হলেন সপ্তাহব্যাপী দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন কর্মসূচীতে। এরপর সপ্তাহে ২ বার ৪ ঘণ্টা করে গ্রুপ আলোচনা। ডা. অরনিশ এঁদের মেডিটেশন ও কিছু যোগাসনের কলাকৌশল শেখালেন। এর সাথে প্রতিদিন আধ ঘণ্টা করে হাঁটা। এক ঘণ্টা করে মেডিটেশন ও যোগব্যায়াম। আর নিরামিষ খাবার। এঁরা কোন ওষুধ ব্যবহার করবেন না।

আর দ্বিতীয় দল, অর্থাৎ কন্ট্রোল গ্রুপের ১৯ জনকে আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের নির্দেশিত পথ্যবিধি অনুসরণ করতে বলা হলো। প্রয়োজনে কোলেস্টেরল কমাবার ওষুধ এঁরা ব্যবহার করতে পারবেন। আর হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের হৃদ্‌রোগ মোকাবিলায় করণীয় কার্যক্রম অনুসরণ করবেন।

দু'গ্রুপের লোকজনকেই বিশেষ তত্ত্বাবধানে রাখা হলো। পথ্যবিধি মানছেন কিনা, ব্যায়াম ঠিকভাবে করছেন কিনা, মেডিটেশন নিয়মিত হচ্ছে কিনা, গ্রুপ আলোচনা চলছে কিনা, তা নিয়মিত মনিটর করা হলো।

রোগের অবস্থা পুনরায় আগাগোড়া নিরীক্ষণ করা হলো এক বছর পর। পাওয়া গেল অদ্ভুত ফল। ডা. অরনিশের কার্যসূচী যাঁরা অনুসরণ করছিলেন তাঁদের ধমনীতে জমে থাকা হলুদ চর্বি বা কোলেস্টেরল পরিষ্কার হয়ে রক্ত চলাচল বেড়ে যাওয়ায় তাঁরা ভীতিকর বুকব্যথা থেকে মুক্তি পান এবং তাঁদের হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা কমে

আসে। অপরদিকে কন্ট্রোল গ্রুপের ১৯ জন যে অবস্থায় ছিলেন, সে অবস্থায়ই থেকে গেলেন। তাঁদের অবস্থার কোন উন্নতি হলো না।

হৃদ্‌রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে ডা. অরনিশের সাফল্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এর আগে রক্ষণশীল ডাক্তাররা বিশ্বাস করতেন যে, আর্টারি একবার ব্লক হতে শুরু করলে এর গতি আর পাল্টানো যায় না। কিন্তু ডা. অরনিশ প্রমাণ করলেন, ওষুধ ছাড়াই জীবনধারায় নিয়মশৃঙ্খলা অনুশীলন ও অভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমেই তা করা যায়।

হৃদ্‌রোগ নিরাময়ে ডা. অরনিশের ফর্মুলা খুব সহজ। এর ব্যয়ও কম। বাইপাস সার্জারিতে যেখানে ১৫ লাখ টাকা প্রয়োজন সেখানে অরনিশ থেরাপিতে খরচ হয় মাত্র ২ লাখ টাকা। আর বাংলাদেশে অরনিশ থেরাপির প্রক্রিয়ায় আপনি চলতে চাইলে বড়জোর খরচ হবে ২০ হাজার টাকা মাত্র।

ডা. অরনিশের হৃদ্‌রোগ থেরাপি ৪টি ভাগে বিভক্ত।

প্রথমত, মেডিটেশন। মেডিটেশন অর্থ, আমাদের প্রাচ্যের যে কোন ধ্যানপদ্ধতি বা মোরাকাবা পদ্ধতি অনুসরণ করে দেহ মনকে শিথিলায়ন করা। মেডিটেশন মনকে যেমন প্রশান্ত করে, তেমনি জীবনের প্রতি ইতিবাচক বা প্রো-অ্যাকটিভ দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করে। জীবন থেকে অহেতুক উত্তেজনা ও মানসিক চাপ বা টেনশনকে দূর করে দেয়।

দ্বিতীয়ত, ব্যায়াম। ডা. অরনিশ সব সময় মাঝারি ব্যায়াম, হাঁটা ও যোগব্যায়ামের পক্ষে। প্রথমে দৈনিক ২০-৩০ মিনিট হাঁটা। আস্তে আস্তে সহ্য করিয়ে নিয়ে হাঁটা। এবং এর সাথে কিছু বিশেষ যোগাসন। হালকা প্রাণায়াম বা বিশেষ পদ্ধতিতে দম নেয়া ও দম ছাড়া।

তৃতীয়ত, খাদ্যাভ্যাস। ডা. অরনিশের মতে, হৃদ্‌রোগীর জন্য খাবার ও পথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চর্বি কমানোর জন্যে অরনিশ মোট ক্যালোরির ১০ শতাংশ চর্বি খেতে দিলেন। মাছ-গোশত বা আমিষ চর্বির পরিবর্তে বাদাম ও নিরামিষ চর্বি খেতে দেয়া হলো। রোগীর খাবার হলো ভাত, রুটি, সবুজ শাক, শিম, মটরশুঁটি, বিন, সবজি, তাজা বা শুকনো ফল। এগুলোর পরিমাণ একটু বেশি হলেও ক্ষতি নেই। এছাড়া প্রতিদিন দই। কাঁচা লবণ এবং চা-কফি ও অ্যালকোহল পুরোপুরি বাদ দিয়েছেন তিনি খাবার তালিকা থেকে। ধূমপানও বর্জন করতে হবে।

চতুর্থত, গ্রুপ আলোচনা। হৃদ্‌রোগের পেছনে অন্যতম একটি প্রধান কারণ হচ্ছে মনোগত দুঃখ বা মানসিক আঘাত। হৃদ্‌রোগীরা অন্তরে একধরনের নিঃসঙ্গতায় ভোগেন। নিজেদের পরিত্যক্ত বা আপনজনহীন মনে করেন। আর কিছু করার নেই, এমন ধরনের হতাশায়ও ভোগেন তাঁরা। এই নিঃসঙ্গতা বা হতাশা কাটিয়ে ওঠার জন্যে তিনি নিয়মিত গ্রুপ আলোচনার ব্যবস্থা করেন। এতে সবাই নিজ নিজ দুঃখ-কষ্টের কথা অকপটে বলে নিজেকে হালকা করেন। কারণ দুঃখ, মনের কষ্ট বা মানসিক চাপ হৃদয়কে ব্যথিত করে হৃদ্‌রোগ সৃষ্টি করে। আর যখনই হৃদয় থেকে এই চাপা বিষবাষ্প বেরুতে শুরু করে, হৃদয় হালকা হয়ে ওঠে আর হৃৎপিণ্ড সুস্থতার পথে এগুতে থাকে।

আমাদের দেশের হাজার হাজার হৃদ্‌রোগী যাঁরা এই রোগ থেকে নিরাময়ের জন্যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করছেন, বিদেশে যাচ্ছেন, তাঁরা দেশে বসেই ডা. অরনিশের থেরাপি প্রয়োগ করে আবার সুস্থ পরিপূর্ণ জীবন পেতে পারেন।

নিরাপদ ব্যথানাশক শিথিলায়ন

নগর জীবনে কোন বাসা পাওয়া যাবে না, যে বাসায় ব্যথানাশক ওষুধ বা 'পেইন-কিলার' নেই। নানা নামে নানা মোড়কে সযত্নে রাখা হয় এই ব্যথানাশক ট্যাবলেট। কোনটা মাথা ব্যথার জন্যে, কোনটা ঘাড়ে ব্যথার জন্যে, কোনটা কোমরে ব্যথার জন্যে, কোনটা হাঁটুতে ব্যথার জন্যে। প্রয়োজনে একাধিক ট্যাবলেট পানির সাথে গলাধঃকরণ করে ফেলি। ব্যথা দূর না হলেও আমরা সাময়িক উপশম অনুভব করি। ব্যথা নাশক ওষুধ যতই খাই না কেন ব্যথার পুনরাবৃত্তি বারবার ঘটে। আর বারবারই ব্যথার ওষুধ খেলে পাকস্থলীর ভেতরে আবরণী ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এর নানা পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তাই ওষুধ ছাড়াও ব্যথা নিরাময় করা যায় এ খবর নিঃসন্দেহে একটা বড় খবর। আর ডাক্তারই যদি বলেন যে, সবচেয়ে শক্তিশালী বেদনানাশক হচ্ছে আপনার মন, তখন খবরটি নিঃসন্দেহে অনেক গুরুত্ববহ হয়ে দাঁড়ায়।

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব হেলথের বাঘা বাঘা ডাক্তারদের সমন্বয়ে গঠিত বিশেষজ্ঞ প্যানেল সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন যে, গভীর শিথিলায়ন ওষুধ ও সার্জারির মতই দ্রুত ক্রনিক ব্যথা থেকে মুক্তি দিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত চিকিৎসা বিজ্ঞানের সনাতন ধারণা থেকে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম। এই প্রথম বারের মত যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে প্রথিতযশা চিকিৎসাবিদরা সরকারী ভাবে শিথিলায়নকে কোমরব্যথা, মাথাব্যথা, আর্থ্রাইটিস এবং অন্যান্য ক্রনিক ব্যথা নিরাময়ের কার্যকরী প্রক্রিয়া হিসেবে স্বীকৃতি দিলেন। আর পেইন কিলার বা সার্জারির পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া থাকলেও শিথিলায়নের তেমন কোন পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া নেই। চুপচাপ বসে দম অবলোকন করতে গিয়ে আজ পর্যন্ত কারোই পাকস্থলীর আবরণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। শিথিলায়নকে নিরাময় প্রক্রিয়া হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার খবর বেড়িয়েছে ডাক্তারদের বিখ্যাত সাময়িকী জার্নাল অফ দি আমেরিকান মেডিকেল এসোসিয়েশন-এর জুলাই ২৪/৩১, ১৯৯৬ সংখ্যায়।

শিথিলায়নের মাধ্যমে ব্যথা উপশম করার জন্যে আপনার দরবেশ, সন্ন্যাসী বা ভিক্ষু হওয়ার প্রয়োজন নেই। এ জন্যে নির্বাণ বা ফানাফিল্লাহর স্তরেও আপনাকে যেতে হবে না। এ জন্যে চুপচাপ একটু নীরবে বসার মত জায়গা পেলেই যথেষ্ট। কারণ শিথিলায়নের পুরো প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে মনের। শিথিলায়ন ভেতর থেকে কাজ করে। দৈনন্দিন চিন্তা থেকে নিজেকে কিছুক্ষণের জন্যে আলাদা করে ফেললেই আপনি শিথিল হতে শুরু করেন। মাইন্ড বডি ইন্সটিটিউটের প্রেসিডেন্ট ও হার্বার্ড মেডিকেল স্কুলের বিহেভিওরাল মেডিসিনের পরিচালক ডা. হার্বার্ট বেনসন খুব চমৎকারভাবে বলেছেন, ভেতর থেকে শিথিল হতে শুরু করলেই আপনার শরীর ১৮০ ডিগ্রী মোড় নেয়, উত্তেজনা থেকে পুনর্নির্মাণের স্তরে ফিরে যায়। পেশী শিথিল হয়ে যায়, দম ধীর হয়, বিপাক ক্রিয়া ও রক্তচাপ কমে যায়। পক্ষান্তরে উত্তেজিত অবস্থায় পেশী শক্ত হয়ে যায়, রক্তচাপ বাড়ে, দম দ্রুত হয়, ব্যথা-বেদনা বেড়ে যায়।

ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল স্কুলের এনেসথেসিওলজি ও ব্যথা গবেষণা বিভাগের প্রফেসর ডা. ডেনিস টার্ক খুব সুন্দরভাবে বলেছেন, গভীর শিথিলায়ন শর্ট সার্কিটে করে ব্যথা বিনাশের সাথে সাথে ব্যথার সাথে জড়িত আবেগকেও বিনাশ করে। তিনি বলেন, 'সবচেয়ে কষ্টকর ব্যাপার হচ্ছে, রাত

তিনটার সময় যখন আপনি প্রচণ্ড মাথাব্যথা বা ব্যাক পেইন-এর কারণে জেগে ওঠেন তখন আপনার নিজেকে প্রচণ্ড অসহায় মনে হয়। মনে হয় এখন আপনার কিছুই করার নেই। আপনি বিছানায় শুয়ে আহাজারি করেন। ভাবেন কিছুই করার নেই। সে সময় যদি আপনি শিথিলায়নের টেকনিক প্রয়োগ করতে পারেন, তাহলে পরিস্থিতির উপর একটা নিয়ন্ত্রণ আসতে থাকে। অসহায়ত্বের ভাব কমে যায়। সেই সাথে কমে যায় ব্যথার কষ্ট।

ব্যথা-বেদনা নাশে শিথিলায়নের প্রভাব সম্পর্কে আমাদের দেশে ডাক্তার ও রোগীদের মধ্যে তেমন কোন সচেতনা না থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রে ডাক্তার ও রোগীদের মধ্যে শিথিলায়ন বা মেডিটেশন সচেতনতা এখন অনেক প্রবল। যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত চিকিৎসা মাসিক প্রিভেনশন-এর জুন, ১৯৯৭ সংখ্যায় সারা দেশে পরিচালিত জরিপের ফলাফল বলা হয়েছে, ৩০% আমেরিকান পেইন কিলার সেবন করে, ৩৫% ব্যথা অবহেলা করে, ২৭% শিথিলায়ন করে ব্যথা কমায়। ৭৫% আমেরিকান মনে করে যে, ওষুধ ছাড়াই ব্যথা উপশম সম্ভব। ২৩% আমেরিকান জানান যে, তাঁদের ডাক্তাররা তাঁদেরকে ওষুধ বাদ দিয়ে শিথিলায়নের মাধ্যমে ব্যথা উপশমের পরামর্শ দিয়েছেন। এই জরিপে দেখা যায় যে, ক্রমঅনুসারে মাথাব্যথা, পেশীর ব্যথা, ব্যাক পেইন, মহিলাদের মাসিকের সময়ের ব্যথা, যন্ত্রণা, আর্থ্রাইটিস, পায়ে ব্যথা এসব সাধারণ ব্যথা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এ ধরনের প্রতিটি ব্যথার ক্ষেত্রেই পেইন কিলারের চেয়ে শিথিলায়নের কার্যকারিতা কোন অংশে কম নয়। আর শিথিলায়ন বা মেডিটেশনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। (ব্যথা নাশে শিথিলায়ন করার জন্যে আপনি প্রজাপতি প্রকাশনের 'কোয়ান্টাম মেথড' বই সংগ্রহ করে শিথিলায়ন আয়ত্ত করতে পারেন।)

সুস্বাস্থ্যের ৫ ভিত্তি

আত্মনির্মাণের জন্যে নিজের মানসিক শক্তিকে সুসংহত করার পাশাপাশি প্রয়োজন শারীরিক শক্তিকে সংহত করা, অর্থাৎ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া। কয়েকটি ছোট ছোট পদক্ষেপ গ্রহণ করে আমরা অনায়াসে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারি। সুস্বাস্থ্যের কোয়ান্টাম ভিত্তি হচ্ছে ৫টি। এই ৫টি ভিত্তিকে ব্যবহার করে আমরা অনায়াসে জীবনকে সুস্বাস্থ্যের নতুন ছন্দে ছন্দায়িত করতে পারি।

১. **দম**। দম হচ্ছে জীবনের মূল ছন্দ। এই দমই শরীরের বাকি সকল ছন্দকে নিয়ন্ত্রণ করে। সঠিক ও পরিপূর্ণ দম প্রতিটি জীবকোষকে প্রকৃতির ছন্দে ছন্দায়িত করে। আর বুক ফুলিয়ে দম নেয়ার মাধ্যমেই আমরা পরিপূর্ণ দম নিতে পারি। বুক ফুলিয়ে দম নেয়ার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্যে দিনে ৫ দফা ১৯ বার করে দম নিন। বুক ফুলিয়ে দম নেয়ার ক্ষেত্রে দম নাক দিয়ে নেবেন, বুক ফুলবে, মুখ দিয়ে ছাড়বেন। প্রথমবার ধীরে ধীরে নাক দিয়ে দম নিয়ে বুক ফোলাতে থাকুন। বুক পুরো ফুলে গেলে ধীরে ধীরে মুখ দিয়ে দম ছাড়ুন। দম ছেড়ে মনে মনে গুনুন: এক। আবার একইভাবে দম নিয়ে দম ছেড়ে গুনুন: দুই। এভাবে উনিশ পর্যন্ত গুনে শেষ করুন। সারাদিনে এরকম ৫ দফা দমের চর্চা করলে আপনার দেহের প্রতিটি কোষ পর্যাপ্ত অক্সিজেন লাভ করবে। আপনি প্রাণবন্ত ও প্রাণোচ্ছল হয়ে উঠবেন। বহুক্ষণ একনাগাড়ে কাজ করতে পারবেন। সহজে ক্লান্ত ও অবসন্ন হবেন না।

২. **আহার**। দমের পরই দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, আহার। সবসময় সুপাচ্য সহজ খাবার গ্রহণ করবেন। অতিরিক্ত মশলা, তেল, ঝাল ও ভাজাপোড়া বর্জন করবেন। খাবারের ব্যাপারে তিনটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম, কী খাবেন? দ্বিতীয়ত, কতটা খাবেন? তৃতীয়ত, কখন খাবেন?

কী খাবেন? সবকিছু খাবেন। যা কিছু আপনার ধর্মবিশ্বাস ও আপনার রুচি অনুমোদন করে, তার সবই খাবেন। আত্মনির্মাণের জন্যে, মেডিটেশনের জন্যে, ধ্যানের জন্যে শুধু নিরামিষ খেতে হবে এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। নিরামিষ খেলে শরীর হালকা স্লিম থাকবে এ ধারণাও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। গরু ঘাস খায়। অর্থাৎ, নিরামিষ খায়। তারপরও যে থলথলে চর্বিদার হয়ে ওঠে। আবার বাঘ শুধু গোশত, অর্থাৎ, আমিষ খায়। তারপরও সে স্লিম, লিকলিকে। নিরামিষ নিয়ে কৌতুকেরও কোন শেষ নেই। এক ভদ্রলোক নিরামিষভোজী হিসেবে পরিচিত। একবার তাঁর বাসায় দাওয়াতে গিয়ে মেহমান বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলেন যে গরুর গোশত পরিবেশন করা হচ্ছে। শুধু মেহমানকে দেয়া হচ্ছে তাই নয়, মেজবান নিজেও গরুর গোশত নিচ্ছেন। মেহমান বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি তো নিরামিষভোজী। আপনি গরুর গোশত খাচ্ছেন কেন?' গৃহকর্তা অম্লানবদনে জবাব দিলেন, 'গরু হচ্ছে "প্রসেসড্ ভেজিটেবল"। দেখুন, গরু নিরামিষ ছাড়া কিছু খায় না। তাই গরুর গোশতকে অনায়াসে প্রক্রিয়াজাত নিরামিষ বলা যায়।' নিরামিষের এমন ব্যাখ্যা শুনলে না হেসে উপায় কী?

আমিষকে নিরামিষ মনে করে খাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। মাছ-গোশতকে আমিষ হিসেবেই খাওয়া যেতে পারে। তবে আমিষ সব সময়ই পরিমিত খাওয়া উচিত। দৈনন্দিন খাবার তালিকায় প্রতিদিন পরিমিত শাকসবজি থাকা উচিত। বাঁধাকপি, ডাঁটা, পুঁইশাক, সজনে ও আঁশ জাতীয় সবজি বেশি থাকা উচিত। সব ধরনের ডাল খাবেন।

মৌসুমী ফল সব সময় পর্যাপ্ত খাওয়া উচিত। একেক মৌসুমে যে ফল হয়, তা সে মৌসুমের রোগের প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে। আম, কাঁঠাল, কলা, কুল, পেয়ারা, আমড়া, আনারস, চালতা, জাম্বুরা, আমলকি, অর্থাৎ, দেশীয় ফল প্রচুর পরিমাণে খাবেন। ফ্লু বা ভাইরাস জ্বরের আক্রমণ শুরু হওয়ার আগেই বাজারে আনারস চলে আসে। তখন পরিমিত আনারস খেলে ফ্লু আক্রমণ করার সুযোগ পায় না? সেজন্যেই বলা হয়, মৌসুমের ফলের মধ্যেই মৌসুমের রোগের দাওয়াই রয়েছে। যাঁদের ঠাণ্ডা লাগার প্রবণতা বেশি তাঁরা শীত আসার একমাস আগে থেকে প্রতিদিন একটি মাঝারি সাইজের জাম্বুরার অর্ধেক খেলে ঠাণ্ডা-সর্দি থেকে অনায়াসে রেহাই পেতে পারেন।

খাবারের ব্যাপারে বিশ্বের সচেতন মানুষেরা এখন প্রাকৃতিক খাবারের প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছেন। পাশ্চাত্যে স্বাস্থ্যসচেতন মানুষ এখন টিনজাত, প্রক্রিয়াজাত ও পরিশোধিত খাবারের বদলে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক খাবারের দিকে ঝুঁকে পড়ছেন। চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ ও পুষ্টিবিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, 'প্রক্রিয়াজাত খাবার বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি এমন কি ক্যান্সার সৃষ্টির কারণ হচ্ছে। তাই ময়দার পরিবর্তে লাল আটা খাবেন। চিনির পরিবর্তে গুড় খাবেন। দুধ-চায়ের পরিবর্তে গুড় দিয়ে হালকা রঙ-চা খাবেন। টিনজাত খাবার পুরোপুরি বর্জন করবেন। ফলের রসের পরিবর্তে টাটকা ফল খাবেন। গুঁড়া দুধ পুরোপুরি বর্জন করবেন। গরুর খাঁটি দুধ প্রত্যেক দিন এক গ্লাস করে খাবেন। হরলিক্স, ওভালটিন ইত্যাদি তথাকথিত পুষ্টিকর খাবার পুরোপুরি বর্জন করে পুষ্টির জন্যে নিয়মিত দুধ, কলা, ডিম খাবেন। মিষ্টি একেবারেই খাবেন না। বিশেষত রঙিন মিষ্টি পুরোপুরি বর্জন করবেন। কারণ খাবারে যে রঙ ব্যবহার করা হয়, তা ক্যান্সার সৃষ্টির কারণ হতে পারে।

তথাকথিত কোমল পানীয় পান করবেন না। কারণ এই পানীয়ের মধ্যে নেশা রয়েছে। আর এই তথাকথিত কোমল পানীয় ডায়াবেটিস এবং কিডনি ও মূত্র ব্যাধির কারণ। কোমল পানীয়ের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে আমাদের দেশের বিশিষ্ট কিডনি ব্যাধি বিশেষজ্ঞ ব্রিগেডিয়ার সিরাজ জিন্নাত ১৯৯৪ সালের বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবসের আলোচনা সভায় সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছেন। কোমল পানীয় আপনার কিডনি ও মূত্রাশয়ের জন্যে অত্যন্ত কঠিন প্রমাণিত হতে পারে। তাই কোমল পানীয়ের পরিবর্তে সবসময় ডাব খাবেন। ডাবের পানিতে ১৯টি প্রাকৃতিক খনিজ দ্রব্য রয়েছে যা স্বাস্থ্যের জন্যে অত্যন্ত উপকারী।

কতটুকু খাবেন? সবসময় পরিমিত খাবার খাবেন। বেশি খেলে আপনার রোগ-ব্যাধি বেশি হবে। এ ব্যাপার হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর একটি হাদিস আমরা অনুসরণ করতে পারি। তিনি বলেছেন: *তুমি তোমার পাকস্থলীর এক-তৃতীয়াংশ খাবার ও এক-তৃতীয়াংশ পানীয় দ্বারা পূর্ণ করো। আর বাকি এক-তৃতীয়াংশ ফাঁকা রাখো।* দীর্ঘ নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, এভাবে খাবার গ্রহণ করলে পাকস্থলীর ব্যাধি থেকে পুরোপুরি মুক্ত থাকা যায় এবং শরীরের ওজন সব সময় নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকে।

কখন খাবেন? বর্তমান বিশ্বের একজন বিশিষ্ট ডায়েটিশিয়ান ডা. পল রোয়েন দীর্ঘ ৩০ বছরের গবেষণায় দেখেছেন যে, রাতে ভূরিভোজন হার্ট অ্যাটাকের মাধ্যমে হঠাৎ মৃত্যুর আদর্শ ব্যবস্থা। তাই রাতে ভূরিভোজন থেকে সবসময় দূরে থাকা উচিত। সুস্বাস্থ্য ও ওজন নিয়ন্ত্রণের জন্যে তিনি বলেছেন: সকালবেলা ভরপেট নাশতা করুন, দুপুরে তৃপ্তির সাথে খান এবং রাতে খুব হালকা খাবার গ্রহণ করুন।

৩. ব্যায়াম। আহারের পর আসে ব্যায়াম বা শরীরচর্চার প্রয়োজনীয়তা। ব্যায়ামের মধ্যে যোগব্যায়াম ও কোয়ান্টাম ব্যায়াম হচ্ছে সবচেয়ে ভাল ব্যায়াম। এর পরই হচ্ছে হাঁটা। প্রতিদিন ২৫/৩০ মিনিট ব্যায়াম করা বা হাঁটা প্রয়োজন।

হাঁটলে ঘণ্টায় ৪ মাইল গতিতে হাঁটতে হবে।

৪. **হজম**। যা খেলেন তা হজম হওয়া প্রয়োজন। খাবার হজম না হলে খেয়ে লাভ কী! আর হজমের সমস্যায় যাঁরা ভোগেন তাঁদের কারণটা শারীরিক নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মানসিক। কারণ পাকস্থলীতে যে অ্যাসিড উৎপন্ন হয় তাতে লোহা দিয়ে দিলে লোহা গলে হজম হয়ে যাবে। এই অ্যাসিড এত শক্তিশালী যে, পাকস্থলী যাতে নিজেই হজম না হয়ে যায়, সেজন্যে প্রতি ৫ দিনে পাকস্থলীর আবরণ বদলে যায়, তাই খাওয়ার আগে সবসময় বলবেন: 'যা খাব মজা করে খাব, যা খাব সব হজম হবে।' তাহলেই দেখবেন হজম খুব ভাল হচ্ছে।

৫. **রেচন**। শরীরের বর্জ্য বস্তু শরীর থেকে সবসময় বের করে দিতে হবে। শারীরিক সুস্থতার এটা হচ্ছে এক গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। তাই যাঁদের কোষ্ঠকাঠিন্য আছে তাঁরা প্রচুর শাক ও আঁশযুক্ত সবজি খাবেন। এতে অন্ত্রের ক্যান্সার থেকেও আপনি রেহাই পাবেন। আর পর্যাপ্ত পানি পান করবেন। সবসময় স্বাভাবিক ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করবেন। গরম পানিতে কখনও গোসল করবেন না। এ ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ হচ্ছেন ডা. কাক্কার। তিনি উনিশ বছরের গবেষণায় প্রমাণ করেছেন যে, গরম পানিতে গোসল করলে দেহের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়, আর ঠাণ্ডা পানিতে গোসল দেহের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। শীতকালেও স্বাভাবিক ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করা উচিত। পানি বেশি ঠাণ্ডা হলে তাতে কিছু গরম পানি মিশিয়ে পানির ঠাণ্ডা ভাবটা কমানো যেতে পারে। কিন্তু তারপরও খেয়াল রাখতে হবে যেন পানির তাপমাত্রা শরীরের তাপমাত্রার চেয়ে কম থাকে।

সুস্বাস্থ্যের জন্যে এ ৫টি ধাপ অনুসরণ করুন। আপনি এক প্রাণবন্ত শরীরের অধিকারী হবেন।

নিরাময়: দায়িত্ব নিজেকে গ্রহণ করতে হবে

মহানবী (সঃ) বলেছেন, স্বাস্থ্য ও সুস্থতা স্রষ্টার সবচেয়ে বড় নেয়ামত। আমরা জানি সুস্বাস্থ্য হচ্ছে প্রশান্ত জীবনের প্রথম ভিত্তি। আর প্রশান্তি হচ্ছে সুস্বাস্থ্যের অপরিহার্য উপাদান। সুস্থতা ও প্রশান্তির জন্য প্রয়োজন সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনচেতনা। কারণ চেতনা বস্তুর চেয়ে আর তথ্য শারীরিক শক্তির চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ও সর্বত্রগামী। জীবন সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি আপনাকে সুস্বাস্থ্য ও প্রশান্তির ফল্গুধারায় অবগাহন করাতে পারে। রোগ ও অসুস্থতা থেকে মুক্তির জন্যে তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, শতকরা ৭০ ভাগ রোগের কারণই মানসিক। অর্থাৎ কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে আপনার মানসিক প্রক্রিয়াই ৭০ ভাগ রোগ সৃষ্টির কারণ। শতকরা ২০ ভাগ রোগের কারণ হচ্ছে ইনফেকশন, ভাইরাস আক্রমণ, ভুল খাদ্য গ্রহণ ও ব্যায়াম না করা। শতকরা ১০ ভাগ রোগ হচ্ছে দৈহিক আঘাত, ওষুধ ও অপারেশন প্রতিক্রিয়া। তাই শুধুমাত্র দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে সুস্থ জীবন-দৃষ্টি গ্রহণের মাধ্যমে শতকরা ৭০ ভাগ রোগই নিরাময় হতে পারে। অন্যান্য রোগ নিরাময়েও ওষুধ ও সার্জারির পাশাপাশি সুস্থ জীবন-দৃষ্টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা

আধুনিক চিকিৎসা হিসেবে প্রচলিত পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতি মূলত ওষুধ, রসায়ন ও অপারেশন নির্ভর। আলোড়ন সৃষ্টিকারী কোয়ান্টাম হিলিং-এর প্রবক্তা ডা. দীপক চোপড়া বলেন যুক্তরাষ্ট্রে রোগীরা এক আক্রমণাত্মক যান্ত্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থার শিকার। চিকিৎসা ব্যবস্থার এই যান্ত্রিকতাই যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর শতকরা ৬৬ ভাগ মৃত্যুর জন্য দায়ী। একটি মার্কিন সাময়িকীর বিশেষ নিবন্ধে বলা হয় যান্ত্রিক ও রসায়ন নির্ভর এ চিকিৎসা ব্যবস্থা এখন হয়ে উঠেছে অত্যন্ত ব্যয়বহুল। চিকিৎসা ব্যবস্থা আসলে হয়ে যাচ্ছে 'চিকিৎসা ব্যবসা' বা 'চিকিৎসা বাজার'। আর এই বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে বীমা কোম্পানী, ওষুধ কোম্পানী ও চিকিৎসা প্রযুক্তির কারখানার মালিকেরা। ফলে এ চিকিৎসা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্ষোভ শুধু রোগীদেরই নয়, চিকিৎসা দানকারী বহু কর্মীরও।

ডা. জন রবিন্স এ অবস্থার জন্যে চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে রোগীদের ভ্রান্ত ধারণাকেও দায়ী করেছেন। তিনি বলেন, এ সব রোগীরা মনে করে সুস্বাস্থ্য ও নিরাময়ের ব্যবস্থা রয়েছে ডাক্তার, ড্রাগ স্টোর, বা হাসপাতালে। ডাক্তার তাদেরকে ধন্বন্তরী ট্যাবলেট, ক্যাপসুল বা ইনজেকশন দিয়ে ভাল করে দেবেন। এ আশায় রোগীরা ডাক্তারের পর ডাক্তার আর ওষুধের পর ওষুধ বদলায়। কিন্তু নিরাময় লাভ করতে ব্যর্থ হয়। ডা. রবিন্স বলেন, আসলে নিরাময়ের ক্ষমতা, রোগ মুক্তির ক্ষমতা রোগীর মধ্যেই রয়েছে। ডাক্তার শুধু সহায়ক শক্তিমাত্র।

নিজের দায়িত্ব নিজেকেই গ্রহণ করতে হবে

নব্য চিকিৎসা প্রবর্তক ডা. ডীন অরনিশ, ডা. দীপক চোপড়া, ডা. ল্যারী ডসি, ডা. জন রবিন্স, ডা. বার্নি সিজেল, ডা. ক্রিশ্চিয়ান নর্থট্রপ, ডা. হার্বার্ট বেনসন, ডা. জোয়ান রবিসেঙ্কো, ডা. এন্ড্রু ওয়েলস, ডা. এডওয়ার্ড টাওব, ডা. মিখাইল

স্যামুয়েলস প্রমুখ—'বডি, মাইন্ড, স্পিরিট' সাময়িকীর ১৯৯৭ সালের বিশেষ সংখ্যায়, 'একবিংশ শতকের স্বাস্থ্য' প্রচ্ছদ কাহিনীতে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে মত প্রকাশ করেছেন, সুস্থ থাকতে হলে নিজের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব নিজেকেই গ্রহণ করতে হবে। নিজেকে নিরাময় করার ক্ষমতা প্রতিটি মানুষের সহজাত নিরাময় ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। এই সহজাত ক্ষমতার সঙ্গে নিজের বিশ্বাসকে সম্পৃক্ত করতে পারলে প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থার শতকরা ৯০ ভাগ খরচই অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে। কারণ বাইপাস সার্জারি, এনজিও প্লাস্টি বা সারাজীবন কলেস্টেরল নিয়ন্ত্রক ওষুধ সেবনের চেয়ে জীবন-দৃষ্টি পরিবর্তন করে জীবন ধারা পরিবর্তনে খরচ অনেক অনেক কম। ডা. হার্বার্ট বেনসন বলেন, একজন মানুষ নিজে নিজেই শিথিলায়ন, মেডিটেশন, ব্যায়াম ও পুষ্টি সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং তার নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে পারে। বর্তমানে যেখানে রোগী ওষুধ বা সার্জারির ওপর নির্ভর করছে সেখানে তাদেরকে নিজের ওপর নির্ভর করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

সুস্থ জীবন যাপনের জন্য নব্য চিকিৎসা ব্যবস্থার অনুসারী হওয়ার কোন বিকল্প নেই। আপনাকেই আপনার স্বাস্থ্য ও নিরাময়ের দায়িত্ব নিতে হবে। ডাক্তার, ওষুধ, সার্জারি সবই হবে আপনার সহযোগী শক্তি।

সুস্বাস্থ্য ও নিরাময়ের জন্য নিয়মিত প্রার্থনা

মহানবী (সঃ) বলেছেন, প্রতিটি রোগের নিরাময় রয়েছে। নিজের ও অন্যের নিরাময়ের জন্যে ওষুধ ছাড়াও দোয়ার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাই নিজের ও অন্যের সুস্বাস্থ্য ও নিরাময়ের জন্যে জীবন-দৃষ্টি ও জীবন-ধারা পরিবর্তনের জন্যে পরম করুণাময়ের কাছে নিয়মিত প্রার্থনা করুন। দোয়া ও প্রার্থনার গুরুত্ব সম্পর্কে চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডা. ল্যারী ডশি বলেছেন প্রার্থনা ও বিজ্ঞান আলাদা কিছু নয়। তাঁর সাম্প্রতিক বই 'প্রেয়ার ইজ গুড মেডিসিন'-এ তিনি নিরাময়ে প্রার্থনা এবং দোয়ার ভূমিকা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে পরিচালিত বহু গবেষণা রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। রিপোর্টে দেখা গেছে যেসব হৃদরোগীর জন্যে প্রার্থনা করা হয়েছে, তাদের গড়পড়তা নিরাময় প্রার্থনা করা হয়নি এমন রোগীদের চেয়ে অনেক ভাল। তিনি বলেন, প্রার্থনা হচ্ছে চেতনার শক্তিকে বহির্গামী করা। আমরা আগে স্বীকার করতাম না, আমাদের চিন্তা ও চেতনা আমাদের মস্তিষ্ক ও শরীরের বাইরে কাজ করতে পারে। কিন্তু অন্যের ব্যাপারে প্রার্থনার কার্যকারিতা এখন এক প্রমাণিত সত্য। এর প্রচুর উদাহরণ রয়েছে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সঙ্গে এটি হচ্ছে এক যুগান্তকারী সংযোজন। ইতিমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের ১১টি গুরুত্বপূর্ণ মেডিকেল কলেজ নিরাময়ে আধ্যাত্মিকতা প্রয়োগের কোর্স চালু করেছে। এর ফলে ক্রমান্বয়ে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের আত্মিকায়ন সম্পন্ন হবে।

যোগব্যায়াম

শুরু করুন উজ্জীবন দিয়ে

যোগব্যায়াম জ্ঞানীদের ব্যায়াম। দেহমন চাঙা করতে এ ব্যায়ামের কোন বিকল্প নেই। আজ থেকে ৫ হাজার বছর আগে দ্রাবিড় সভ্যতায় এ ব্যায়ামের উদ্ভব ঘটে। দ্রাবিড় সাধকরা যোগব্যায়ামকে তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের অভ্যাস ও সংস্কৃতির অঙ্গে পরিণত করেন। বর্বর আর্যদের আক্রমণে মহেঞ্জোদারো, হরপ্পাসহ দ্রাবিড় সভ্যতার কেন্দ্রসমূহ সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। দ্রাবিড় সভ্যতাকে নিশ্চিহ্ন করলেও দ্রাবিড়দের যোগব্যায়াম সম্পর্কিত জ্ঞান আর্যরা গ্রহণ করে। পরে আর্যরা এই চমৎকার সর্বজনীন ব্যায়াম পদ্ধতির সাথে নিজস্ব কিছু ধর্মবিশ্বাস যোগ করে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে এর চর্চাকে সীমিত করে ফেলে। বিশ্বের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও কার্যকর ব্যায়াম পদ্ধতি মূলত বন্দী হয়ে পড়ে কিছু কিছু আশ্রমের চৌহদ্দির মধ্যে।

দ্রাবিড় নগরসভ্যতায় যে ব্যায়াম ছিল সর্বজনীন, তা আবার তার নিজস্ব মহিমায় ভাস্বর হয়ে ওঠে বিংশ শতাব্দীতে এসে। বিশেষ সাম্প্রদায়িক বিশ্বাসের চৌহদ্দি ছিন্ন করে এটি এখন আধুনিক মানুষের দেহ-মন সুস্থ রাখার আন্দোলনে রূপ নিয়েছে। তাই স্বাস্থ্যসচেতন পাশ্চাত্যে এখন অ্যারোবিক ক্রেজে ভাটা পড়ে শুরু হয়েছে যোগব্যায়াম চর্চা। আপনিও দেহমনকে সুস্থ সবল ও চাঙা রাখার জন্যে শুরু করতে পারেন যোগব্যায়াম।

যোগব্যায়াম শুরু করলে প্রথমেই শরীরটাকে উজ্জীবিত করা বা 'ওয়ার্ম-আপ' করে নেয়া ভাল। দেহকে একটু উজ্জীবিত করে নিলে দেহ নমনীয় হবে এবং পরবর্তী যোগাসনগুলো করা সহজ হবে। ১৫টি ধাপে বিভক্ত এই অনুশীলনীর মাধ্যমে আপনার পেশী ও হাড়ের জয়েন্টের জড়তা কেটে যাবে এবং আপনার শরীর ব্যায়াম ও যোগাসনের জন্যে প্রস্তুত অবস্থায় চলে আসবে। যে কোন ব্যায়ামের আগেই একটু ওয়ার্ম-আপ (Warm-up) প্রয়োজন। এই ১৫ ধাপের অনুশীলন শরীরকে চমৎকার ভাবে ওয়ার্ম-আপ করে বলেই একে 'উজ্জীবন' বলা হয়। এই অনুশীলনকালে দম স্বাভাবিক থাকবে।

উজ্জীবনের ১৫ ধাপ

প্রস্তুতি: দু'পায়ের মাঝখানে ৪ আঙুল ফাঁক রেখে দু'হাত শরীরের দু'পাশে রেখে বুক টান করে সোজা হয়ে দাঁড়ান।

১. বুক টান করে সোজা দাঁড়ানো অবস্থায় দু'হাত সোজা উপরে তুলুন। খেয়াল রাখুন আপনার শরীরের ওজন যেন দু'পায়ের ওপর সমানভাবে পড়ে। কোনদিকে কাত হবেন না বা কোন পায়ে ভর বেশি দেবেন না।

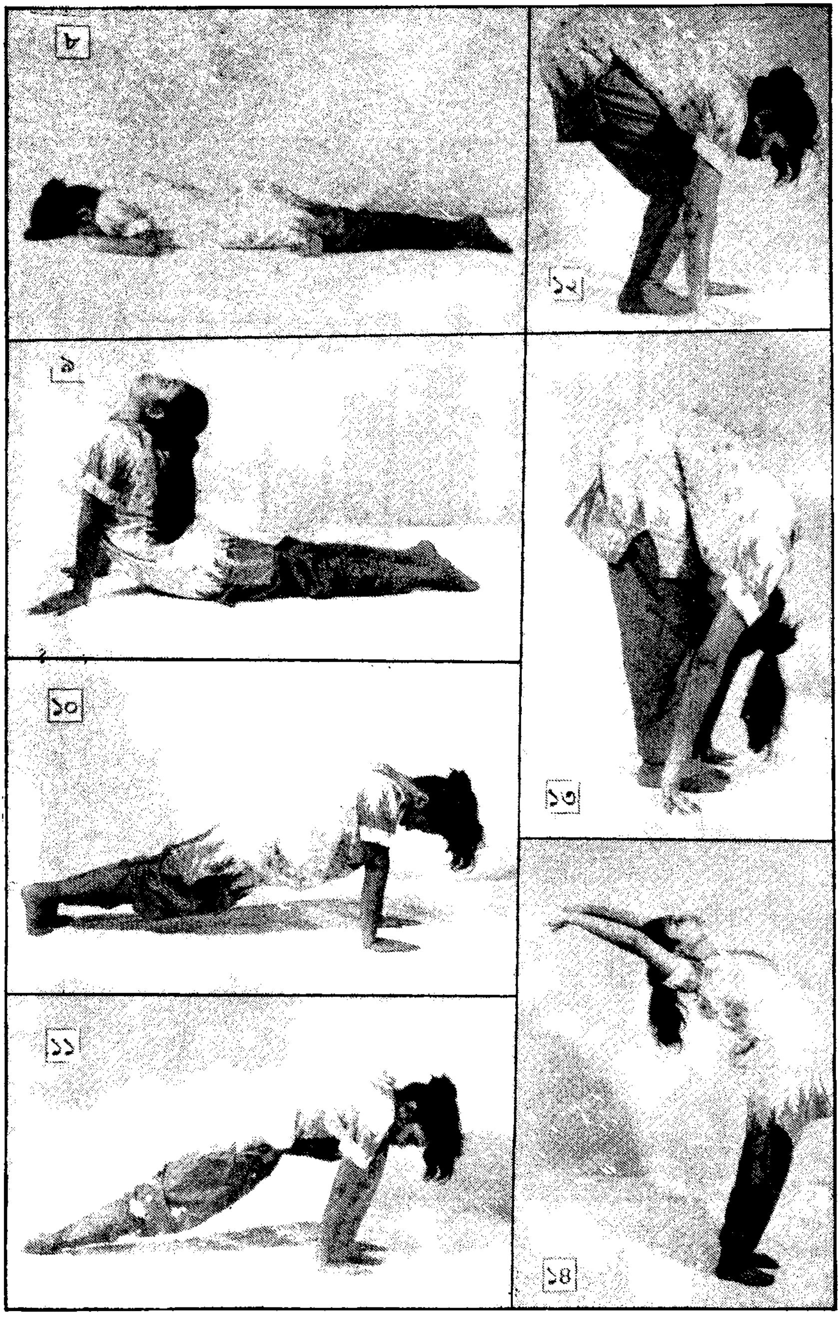
২. ধীরে ধীরে হাত ও মাথা পেছনদিকে নিতে থাকুন। কোমর থেকে মেরুদণ্ড পেছনদিকে বেঁকে যাবে। হাঁটু ভাঙবে না। পা সোজা থাকবে। ঘাড় থাকবে শিথিল। যতদূর সম্ভব শরীরকে পেছনের দিকে বাঁকিয়ে দিন।

৩. পুরো সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ুন। কপাল যতদূর সম্ভব হাঁটুর কাছাকাছি নিয়ে আসুন। হাতের আঙুল মেঝে স্পর্শ করবে।

৪. হাঁটু ভেঙে কোমর ও মাথা মাটির সমান্তরালে নিয়ে আসুন। হাতের আঙুল ও করতল এবার সুন্দরভাবে মেঝে স্পর্শ করবে। হাতের ওপর কিছুটা ওজন থাকবে।

৫. দু'হাতের ওপর ভর দিয়ে প্রথমে ডান পা পেছনদিকে নিন।


১
২
৩
উজ্জীবনের
১৫
ধাপ
৪
৫
৭
৬


৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪

৬. বাম পাও পেছনদিকে নিন। সমস্ত শরীরের ওজন হাত ও পায়ের আঙুলের ওপর পড়বে। মাথা ও কোমর মেঝের সমান্তরাল থাকবে।

৭. পা ও ঊরু মাটির সাথে লেগে থাকবে। কোমর থেকে মেরুদণ্ড বাঁকিয়ে হাতে ভর দিয়ে মাথা যতদূর সম্ভব পেছনের দিকে নিয়ে যান।

৮. সমস্ত শরীর মেঝেতে লাগিয়ে দিন। পা, হাঁটু, পেট, বুক, কপাল সব মেঝেতে লেগে যাবে, হাতদুটো থাকবে মাথার দু'পাশে।

৯. হাতের ওপর ভর দিয়ে আবার মেরুদণ্ড বাঁকিয়ে মাথা পেছন দিকে হেলিয়ে দিন। হাঁটু জোড়া লেগে থাকবে। (৭ নং অবস্থানের মত।)

১০. আগের মত দু'হাত ও দু'পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে কোমর ও মাথা মাটির সমান্তরাল রাখুন। (৬নং অবস্থানের মত।)

১১. প্রথম ডান পা হাতের সামনে আনুন। অন্য পায়ের পাতা পেছনে মাটিতে লাগানো থাকবে।

১২. হাঁটু ভাঙা অবস্থায় দু'হাতের পাশে দু'পা রাখুন। কোমর ও মাথা মেঝের সমান্তরাল থাকবে। (৪নং অবস্থানের মত।)

১৩. দু'পায়ের ওপর ওজন রেখে হাঁটু সোজা করুন। কপাল হাঁটুর কাছাকাছি থাকবে। হাতের আঙুল মাটি স্পর্শ করবে। (৩নং অবস্থানের মত।)

১৪. হাঁটুর কাছ থেকে মাথা উঠিয়ে মেরুদণ্ড বাঁকিয়ে একেবারে পেছনদিকে মাথা হেলিয়ে দিন। হাতদুটো মাথার পেছনে থাকবে। (২নং অবস্থানের মত।)

১৫. এবার বুক টান করে হাত সোজা উপরের দিকে আনুন। (১নং অবস্থানের মত।)

১৫টি ধাপ সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে আপনি উজ্জীবনের ১ রাউন্ড সম্পন্ন করলেন। ১৫টি ধাপের এটি একটি চমৎকার ব্যায়াম। পূর্ববর্তী ধাপের বিপরীত অবস্থান হচ্ছে পরবর্তী ধাপ। বিভিন্নভাবে শরীর ও পেশীর সঙ্কোচন ও প্রসারণ হয় এর মধ্য দিয়ে। মেরুদণ্ড, ঘাড়, হাতপায়ের জয়েন্ট, কোমর সবকিছুর ব্যায়াম এতে একসাথে হয়। শুরুতে ৫ রাউন্ড করে করবেন। ক্রমান্বয়ে আপনি ১৫ রাউন্ড পর্যন্ত করতে পারেন। যোগাসন শুরুর আগে উজ্জীবন করে নিলে অন্য আসনগুলো বেশ সহজ হবে আপনার জন্যে। উজ্জীবন অনুশীলন করলে দম সবসময় স্বাভাবিক রাখবেন।

যোগব্যায়াম: শেষ করুন শিথিলায়ন দিয়ে

যোগব্যায়াম শুরু করবেন উজ্জীবন দিয়ে। আর তা শেষ হবে শিথিলায়ন দিয়ে। উজ্জীবনের মধ্য দিয়ে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও পেশীতে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায়। দেহকোষগুলো সজীব-সক্রিয় হয়ে ওঠে। দেহের বিপাক ক্রিয়া দ্রুততর হয়। দেহের সবকিছুই সক্রিয় হয়ে ওঠে। আর শিথিলায়নে দেহের প্রতিটি অঙ্গ ও পেশী পুরোপুরি বিশ্রাম লাভ করে।

উজ্জীবন শারীরিক কার্যক্রমকে সক্রিয় করে। আর শিথিলায়ন করে নিষ্ক্রিয়। সক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয়তার মাঝে একটি ছন্দ সৃষ্টি হলে প্রাণশক্তি বৃদ্ধি পায়। তাই ব্যায়ামের মাধ্যমে পেশী ও অঙ্গকে সক্রিয় করে তোলার পর শিথিলায়নের মাধ্যমে পেশী ও অঙ্গকে পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় করলেই আপনি ব্যায়ামের সুফল পুরোপুরি ভোগ করতে পারবেন। ব্যায়ামের পর শিথিলায়ন করলেই আপনি নতুন প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবেন। নতুন উদ্যমে আপনি আপনার কাজ শুরু করতে পারবেন।

শিথিলায়ন প্রক্রিয়া

শিথিলায়ন খুবই সহজ। ধাপে ধাপে করলে আপনি খুব সহজেই দেহমনকে শিথিল করে নতুন প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত হতে পারবেন। শিথিলায়নের ধাপগুলো নিম্নরূপ:

১. ব্যায়ামের শেষে ব্যায়ামের বিছানার উপর সটান চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ুন। দু'হাত শরীরের দু'পাশে রাখুন। হাতের তালু উপরের দিকে থাকবে। দু'পায়ের মাঝে চার আঙুল পরিমাণ ফাঁক থাকবে। মাথাটা ডানদিকে একটুখানি কাত হয়ে থাকবে।

২. এভাবে শুয়ে পড়ার পর চোখ বন্ধ করুন এবং ধীরে ধীরে লম্বা দম নিন। এবং ধীরে ধীরে দম ছাড়ুন। দম নেয়ার সময় ধীরে ধীরে আপনার পেটের উপরিভাগ ফুলবে এবং দম ছাড়ার সাথে সাথে পেটের উপরিভাগ চুপসে যাবে। চোখ বন্ধ করে দম নেয়ার সময় ভাবুন, প্রকৃতি থেকে অফুরন্ত প্রাণশক্তি আপনার শরীরে প্রবেশ করছে আর দম ছাড়ার সময় ভাবুন শরীরের সকল দূষিত ও ক্ষতিকর পদার্থ বাতাসের সাথে বেরিয়ে যাচ্ছে। এভাবে ৫/৭ বার দম নিন, দম ছাড়ুন। দম নাক দিয়ে নেবেন, মুখ দিয়ে ছাড়বেন। মনে করতে থাকুন যে আপনার শরীর নিস্তেজ হয়ে আসছে।

৩. এবার মনের চোখে শরীরের সকল অঙ্গের উপর একবার নজর বুলিয়ে যান। নজর বোলানোর পর প্রথমে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করুন মাথার তালুর পেশীগুলোতে। অনুভব করুন সেখানে রক্ত চলাচল বাড়ছে, একটু গরম-গরম লাগছে, একটু শিরশির করছে। পেশী শিথিল হয়ে যাচ্ছে, পেশী ভারী হয়ে যাচ্ছে। এমনিভাবে আপনি এক এক করে কপাল, চোখ ও চোখের পাতা, চোয়াল, ঠোঁট, জিহ্বা, মুখমণ্ডল, গলা, ঘাড়, কাঁধ, ডানহাত, বামহাত, বুক, পিঠ, গোড়ালি ও পায়ের পাতায় মনোযোগ দিন। মনোযোগ দেয়ার সাথে সাথে অনুভব বা কল্পনা করবেন যে সেখানে রক্ত চলাচল বাড়ছে, একটু গরম-গরম লাগছে বা শিরশির করছে। এরপরেই কল্পনা করবেন যে, পেশী শিথিল হয়ে গেছে, পেশী ভারী হয়ে গেছে। যে অঙ্গগুলোর নাম উল্লেখ করা হলো তার প্রতিটির জায়গায় চার থেকে পাঁচ সেকেন্ড সময় ব্যয় করুন। কল্পনা করুন যে এই অঙ্গগুলো ভারী হয়ে যাচ্ছে এবং সারা শরীরে শিথিলতা স্রোতের মত উপর থেকে নিচের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। এখানে এসে আপনি কল্পনা করুন যে আপনি যেন বরফের তৈরি। বরফ গলে যেমন নিচের দিকে নামে তেমনি আপনার শরীরের প্রতিটি কোষ শিথিল হয়ে নিচের দিকে চাপ সৃষ্টি করছে।

৪. এবার নাক দিয়ে খুব ধীরে ধীরে দম নিয়ে ধীরে ধীরে দম ছাড়ুন। ৫/৭ বার এরকম দম নিয়ে দম ছাড়ুন। শরীর আরও ভারী লাগতে শুরু করবে।

৫. এবার শুধু দমের দিকে খেয়াল দিন। অনুভব ও অবলোকন করুন বাতাস কিভাবে নাক দিয়ে ফুসফুসে গিয়ে আবার বেরিয়ে আসছে। আপনার দম এমনিতেই ধীর হয়ে গেছে। দমের প্রতি খেয়াল দেয়ার পর আপনার শরীর আরও ভারী লাগতে শুরু করবে। কল্পনা করুন যে আপনার শরীর আরও ভারী হয়ে গেছে।

৬. এবার কল্পনা করুন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আপনার শরীরকে নিচের দিকে টানছে। অনুভব করুন আপনার শরীরের ওজন বেড়ে গেছে। হাত, পা, মাথা, কাঁধ, শরীর সব ভারী হয়ে মেঝের মধ্যে যেন ঢুকে যেতে চাইছে। এবার কল্পনা করুন আপনার অঙ্গগুলো এত ভারী হয়ে গেছে যে সেগুলো আর জৈব পদার্থ নেই, জড় পদার্থে পরিণত হয়েছে। এবার নিজের দেহকোষগুলোকে ভাবুন ও অনুভব করুন বালুকণা হিসেবে।

৭. এবার অনুভব করুন আপনার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ থেকে বালুকণাগুলো ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ছে। আঙুল, হাত, পা, পিঠ, কাঁধ সব ঝরে ঝরে পড়ে যাচ্ছে। অনুভব ও কল্পনা করুন, আপনার শরীর বলে আর কিছুই নেই। আপনি এক বালুর স্তূপে পরিণত হয়েছেন।

৮. আপনি এখন বালুর স্তূপ। ঠাণ্ডা বাতাস এসে ঝড়ের মত সমস্ত বালুকণাগুলো উড়িয়ে নিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। বাতাস বালুকণাগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ায় এবার অনুভব করুন, আপনার শরীর বলতে আর কিছুই নেই। আপনার বলতে এখন রয়েছে শুধু আপনার মন, আপনার চেতনা। আপনি এখন পুরোপুরি শিথিল।

৯. দেহের শিথিলতার সাথে সাথে মনের শিথিলতা আনয়নের জন্যে এবার সুন্দর দৃশ্যের কল্পনা করুন। এ দৃশ্য হতে পারে সমুদ্রসৈকত, লেক বা নদীর পাড় বা এমন কোন প্রাকৃতিক দৃশ্য যা আপনাকে আনন্দে আপ্লুত করে তোলে।

১০. এভাবে কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত হতে দিন। শরীর-মন শিথিল হওয়ার সাথে সাথে আশ্চর্য এক প্রশান্তি অনুভব করবেন।

১১. এই নিশ্চল-নিশ্চুপ অবস্থায় ৫/১০ মিনিট সময় অতিবাহিত করুন। লম্বা দম নিয়ে আস্তে আস্তে চোখ মেলুন। আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসুন।

এভাবে শিথিলায়নের ফলে শরীরের প্রতিটি পেশী বিশ্রাম পেয়ে নতুন প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে উঠবে। দেহমনে পাবেন এক সুন্দর প্রশান্তি। বেশ আরামদায়ক ঘুমের পর শরীর যেমন ঝরঝরে হয়ে ওঠে আপনার শরীরও তেমনি ঝরঝরে হয়ে উঠবে। শান্ত মন ও প্রাণবন্ত দেহে পরবর্তী কাজগুলো করতে পারবেন।

আপনার শরীর কতটুকু ভাল আছে?

আপনি কি ভাল আছেন? ভাল থাকা হচ্ছে এমন এক ছন্দময় অস্তিত্ব, যা প্রকৃতির আনন্দলোকে লীন। ভাল থাকা শরীর ও মনের এমন এক গতিশীলতা যেখানে সব কিছুই সহজ। ভাল থাকতে হলে শরীর ও মন দুটোকেই রাখতে হয় তরতাজা। আর এই তরতাজা চনমনে ভাব এমনিই আসে না। সেজন্যে আমাদের সক্রিয় থাকতে হয়। এ সক্রিয়তা ইতিবাচক বা নেতিবাচক হতে পারে। ইতিবাচক তৎপরতার পাল্লা ভারী হলে আপনি সুস্থ ও ভাল থাকবেন আর নেতিবাচক তৎপরতার পাল্লা ভারী হলে আপনি জীবনীশক্তিহীন হয়ে পড়বেন। আপনার সুস্থতা ও ভাল থাকার জন্যে প্রথম জানা প্রয়োজন দৈহিক ও মানসিক গতিশীলতার অবস্থান। আপনার দৈহিক গতিশীলতার অবস্থান জানার জন্যে নিচের প্রশ্নমালার উত্তর দিন। উত্তর শুধুমাত্র হাঁ সূচক হলেই উত্তরে দেয়া নম্বর যোগ হবে। প্রতিটি প্রশ্নের জবাবে প্রাপ্ত নম্বর প্রতিটি প্রশ্নমালার শেষের স্কোরবোর্ডে যোগচিহ্ন (+) অথবা বিয়োগ চিহ্ন (—) দিয়ে বসানো আছে। আপনার স্কোর যোগবোধক বা বিয়োগবোধক যে কোনটি হতে পারে। আপনার শরীর সংক্রান্ত ৫টি প্রশ্নমালা পূরণ করে তা যোগ করতে হবে। যোগফলই বলে দেবে আপনার শক্তির ভারসাম্য, বলে দেবে আপনি দৈহিকভাবে ভাল আছেন কি নেই।

আমরা এবার প্রশ্নমালায় চলে আসি। উত্তর হাঁ সূচক হলে প্রশ্নের পাশে (√) টিক চিহ্ন দিন। উত্তর না সূচক হলে কোন চিহ্ন দেয়ার প্রয়োজন নেই। স্মরণ রাখবেন, উত্তর হাঁ সূচক হলেই প্রশ্নের সংখ্যার পাশে দেয়া নম্বর যোগ বা বিয়োগ চিহ্ন অনুসারে যোগ বা বিয়োগ হবে।

পুষ্টি সংক্রান্ত প্রশ্নমালা

১. একটু দূরে গিয়ে কিনতে হলেও আমি সবচেয়ে তাজা খাবারই কিনব।
২. আমি গোশত বেশি পছন্দ করি।
৩. আমি প্রতিদিন পর্যাপ্ত তাজা সবজি ও ফল খাই।
৪. আমি সাধারণত টিনজাত ও হিমায়িত খাবার খাই।
৫. আমি প্রতিদিন ভাজা-পোড়া খাবার খাই।
৬. আমি প্রতিদিন প্রচুর পানি পান করি।
৭. আমি প্রতিদিন এত বেশি খাবার খাই যে, খাওয়ার পর অস্বস্তিবোধ করি।
৮. গোল আলু, ভাত বা লাল আটার রুটি এবং তাজা ফল ও সবজি আমার খাবারের প্রধান উপাদান।
৯. আমি কদাচিৎ মিষ্টিজাত খাবার খাই।
১০. আমি প্রায়ই গ্যাস, কোষ্ঠকাঠিন্য বা ডায়রিয়ায় ভুগি।
১১. আমি প্রক্রিয়াজাত খাবারের চেয়ে তাজা খাবার বেশি পছন্দ করি।
১২. আমি মাখন বা সস বেশি খাই না।
১৩. আমার ওজন ঠিক মাত্রায় রয়েছে।
১৪. আমি নিরামিষ জাতীয় খাবার পছন্দ করি।
১৫. আমি মাখন, ছানা, পনির ও ঘি জাত খাবার প্রচুর পরিমাণে খাই।
১৬. আমি প্রায়ই বদহজম, গলা-বুক জ্বালাপোড়া করা বা পাকস্থলীর রোগে ভুগি।
১৭. স্বাস্থ্যসম্মত ও পুষ্টিকর খাবার দেখলে আমার আনন্দ হয়।

১৮ আমার ওজন অনেক বেশি (অতিরিক্ত ওজন ২০ কেজির বেশি হলে।)
১৯. আমার ওজন কিছুটা বেশি (অতিরিক্ত ওজন ১০ থেকে ২০ কেজির মধ্যে হলে)।
২০. ফলের রস খেলে একেবারে তাজা রসই পছন্দ।
২১. স্বাস্থ্যসম্মত খাবারের আয়োজন করার সময় আমার নেই।
২২. বেশিরভাগ সময়ই আমি ভরপেট নাস্তা খাই না; খেলেও নামমাত্র খাই।
২৩. স্বাস্থ্যকর খাবারের জন্যে আমি সময় ব্যয় করতে প্রস্তুত।
২৪. তাজা সবজি আমি স্ন্যাক্স হিসেবে খাই।
২৫. আমি নিরামিষভোজী।
২৬. স্বাস্থ্যবান বা বলবান হওয়ার জন্যে আমার প্রচুর গোশত খাওয়ার প্রয়োজন নেই।
২৭. আমি খাবার গোগ্রাসে গিলে ফেলি।
২৮. আমি মাছ-গোশত খাই কিন্তু ঝলসানো গোশত বা কাবাব পছন্দ করি না।
২৯. আমি সালাদ পছন্দ করি।
৩০. আমি কাবাব বা ঝলসানো গোশত খাই না।

স্কোরবোর্ড: পুষ্টি সংক্রান্ত প্রশ্নমালা

১. (+) ৩	২. (—) ১	৩. (+) ৩	৪. (—) ২	৫. (—) ২
৬. (+) ১	৭. (—) ৩	৮. (+) ৩	৯. (+) ২	১০. (—) ২
১১. (+) ২	১২. (+) ১	১৩. (+) ৩	১৪. (+)১	১৫. (—)২
১৬. (—) ২	১৭. (+) ২	১৮. (—) ৩	১৯. (—) ২	২০. (+) ২
২১. (—) ২	২২. (—)২	২৩. (+) ২	২৪. (+) ২	২৫. (+) ৩
২৬. (+) ২	২৭. (—) ২	২৮. (+) ৩	২৯. (+) ৩	৩০. (+) ৩

এবার আপনার প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল লিখুন। যোগফল ২০ বা এর নিচে হলে আপনার পুষ্টিশক্তি ভারসাম্যহীন। যোগফল ২০ থেকে ৩০-এর মধ্যে হলে আপনার পুষ্টিশক্তির ভারসাম্য নড়বড়ে অবস্থায় রয়েছে। আর যোগফল ৩০-এর উপর হলে আপনার পুষ্টিশক্তি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে।

ব্যায়াম সংক্রান্ত প্রশ্নমালা

১. আমি আমার বয়সের তুলনায় নিজেকে সুশক্তির অধিকারী মনে করি।
২. আমার মনে হয় না যে আমি কখনও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারব।
৩. আমি সপ্তাহে অন্তত ৩ দিন ২০ মিনিট করে শারীরিক কসরৎ বা ব্যায়াম করি।
৪. আমি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলে হাঁপিয়ে উঠি।
৫. আমি ব্যায়াম অপছন্দ করি এবং সুযোগ পেলেই ফাঁকি দেই।
৬. সুযোগ পেলেই লিফটে না উঠে আমি সিঁড়ি বেয়ে উঠি।
৭. আমি অলস বসে থাকা অপছন্দ করি।
৮. আমি হাঁটতে ভালবাসি এবং নিয়মিত হাঁটি।
৯. আমি শরীরচর্চা ক্লাবের সদস্য।
১০. আমি নিয়মিত ব্যায়ামের ক্লাসে অংশ নেই।
১১. ব্যায়াম শুরু করার বয়স আমার আর নেই।
১২. আমি নিজেকে অত্যন্ত সক্রিয় ব্যক্তি বলে মনে করি।
১৩. আমি হাইপারটেনশনের রোগী। আমার হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক হয়েছে।

তারপরেই আমি নিয়মিত কোন ধরনের ব্যায়াম করি না।

১৪. যোগ ব্যায়ামের ধারণা আমার কাছে হাস্যকর মনে হয়।
১৫. আমি অনেক বারই ব্যায়াম শুরু করেছি কিন্তু ধরে রাখতে পারিনি।
১৬. ব্যায়াম ও খেলাধুলা সবসময় আমার জীবনের অংশ।
১৭. কোন দিন ব্যায়াম না করলে নিজেকে নির্জীব মনে হয়।
১৮. যখন ব্যায়াম করতে শুরু করি, তখনই অতিরিক্ত ব্যায়াম করে ফেলি। যার জন্যে শরীর ব্যথা হয়ে যায়।
১৯. আমার ব্যায়াম করার কোন সময় নেই।
২০. আমার পরিবারের ও বন্ধুদের অনেকেই ব্যায়াম পছন্দ করে।
২১. আমি যেখানে থাকি সেখানে ব্যায়ামের কোন সুযোগ নেই।
২২. আমার ব্যায়াম করার মত এনার্জি নেই।
২৩. আমি যোগ ব্যায়াম ভালবাসি।
২৪. ব্যায়াম আসলে কোন কাজে আসে বলে আমার মনে হয় না।
২৫. আমার পেশাই এমন যে বেশ শারীরিক পরিশ্রম করতে হয়।
২৬. ব্যায়াম করতে বেশ আনন্দ লাগে।
২৭. আমি বিশ্বাস করি ব্যায়াম স্বাস্থ্যের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
২৮. সুযোগ পেলেই আমি শরীর-হাত পা নাড়াচাড়া করি।
২৯. আমার শরীর নমনীয় নয়।
৩০. আমি মনে করি ব্যায়াম টেনশন, দুঃখ, দুশ্চিন্তা কাটাতে সাহায্য করে।

স্কোরবোর্ড: ব্যায়াম সংক্রান্ত প্রশ্নমালা				
১. (+) ৩	২. (−) ৩	৩. (+) ৩	৪. (−) ২	৫. (−) ৩
৬. (+) ৩	৭. (+) ২	৮. (+) ৩	৯. (+) ২	১০. (+) ২
১১. (−) ৩	১২. (+) ৩	১৩. (−) ৩	১৪. (−) ১	১৫. (−) ১
১৬. (+) ৩	১৭. (+) ২	১৮. (−) ১	১৯. (−) ২	২০. (+) ২
২১. (−) ১	২২. (−)২	২৩. (+) ৩	২৪. (−) ২	২৫. (+) ২
২৬. (+) ২	২৭. (+) ৩	২৮. (+) ৩	২৯. (−)১	৩০. (+) ৩

এবার আপনার প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল লিখুন। যোগফল ২০-এর নিচে হলে আপনার ব্যায়ামশক্তি ভারসাম্যহীন। যোগফল ২০ থেকে ৩০-এর মধ্যে হলে ভারসাম্য নড়বড়ে অবস্থায়। আর ৩০-এর উপর হলে আপনার ব্যায়ামশক্তি সুন্দর ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে।

স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক প্রশ্নমালা

১. রোগগ্রস্ত হওয়ার চেয়ে সুস্বাস্থ্য আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
২. বহু বছরের মধ্যে আমি দাঁতের ডাক্তারের সাথে দেখা করিনি।
৩. যখন সম্ভব আমি নিজেকে প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে ফেলতে চেষ্টা করি।
৪. রাস্তাঘাটে দেয়াল বা রেলিং স্পর্শ করাকে আমি এড়িয়ে চলি।
৫. আমি জানি আমি এক অস্থির গাড়িচালক।
৬. আমি দিনে অন্তত দু'বার দাঁত ব্রাশ করি।
৭. আমার মনে হয় আমি কখনোই পরিপূর্ণ বিশ্রাম বা পর্যাপ্ত ঘুমাতে পারি না।
৮. যৌনতার ব্যাপারে আমি পরিমিত ও সংযমী।

৯. সাধারণত আমি কখনও ঠোঁট দিয়ে টেলিফোন স্পর্শ করি না।
১০ সুযোগ পেলেই আমি যৌন অনাচারে লিপ্ত হই।
১১. প্রতিদিন আমি দাঁত সুন্দর করে পরিষ্কার করি।
১২. রেচন ক্রিয়ার পর আমি সবসময় সাবান দিয়ে ভাল করে হাত ধোয়া প্রয়োজন মনে করি না।
১৩. প্রতি মাসে আমি একবার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভালভাবে নিরীক্ষণ করি।
১৪. আমি আমার দরজা ঠিকভাবে বন্ধ করি ও তালা লাগাই।
১৫. আমি আমার শরীর সবসময় পরিষ্কার রাখি।
১৬. আমার দাঁত ও মাড়ির অবস্থা খুব খারাপ।
১৭. আমি আমার স্ত্রী/স্বামীর বিশ্বস্ত যৌনসঙ্গী।
১৮. যানবাহনে উঠলে নিরাপত্তার প্রতি আমি সমসময় সচেতন।
১৯. খাওয়ার আগে আমি খুব কমই ভালভাবে হাত ধুই।
২০. বাইরে খেলে পরিবেশনকারী যাতে খালি হাতে আমার খাবার স্পর্শ না করে সে ব্যাপারে আমি খেয়াল রাখি।
২১. ধোঁয়া বা ধুলাপূর্ণ স্থান আমি এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করি।
২২. আমি সবসময় প্রখর সূর্যের আলো এড়িয়ে চলি এবং রোদে চলাচল করতে হলে ছাতা ব্যবহার করি।
২৩. আমার ঘর পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম ও নিরাপদ।
২৪. আমি সবসময় পরিষ্কার কাপড় পছন্দ করি।
২৫. বিপজ্জনক এলাকা দিয়ে আমি কখনও রাতে চলাচল করি না।
২৬. আমার ঘরে আমি কখনও ধূমপানের অনুমতি দেই না।
২৭. পাবলিক টয়লেট আমি সাধারণত এড়িয়ে চলি।
২৮. আমি সবসময় বিপজ্জনক ব্যক্তিদের এড়িয়ে চলি।
২৯. নেশাগ্রস্ত অবস্থায়ও আমি কখনও কখনও গাড়ি চালাই।
৩০. বিয়ের বাইরে যৌন সম্পর্ক আমি সবসময় এড়িয়ে চলি।

স্কোরবোর্ড: স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক প্রশ্নমালা

১. (+) ৩	২. (−) ২	৩. (+) ৩	৪. (+) ২	৫. (−) ৩
৬. (+) ২	৭. (−) ২	৮. (+) ৩	৯. (+) ১	১০. (−) ৩
১১. (+) ২	১২. (−) ২	১৩. (+) ৩	১৪. (+) ৩	১৫. (+) ৩
১৬. (−) ২	১৭. (+) ৩	১৮. (+) ৩	১৯. (−) ২	২০. (+) ১
২১. (+) ২	২২. (+)৩	২৩. (+) ২	২৪. (+)৩	২৫.(+)৩
২৬. (+) ৩	২৭. (+) ২	২৮. (+) ৩	২৯. (−)৩	৩০. (+) ৩

এবার আপনার প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল লিখুন। যোগফল ২৫-এর নিচে হলে আপনার স্বাস্থ্যরক্ষাশক্তি ভারসাম্যহীন। যোগফল ২৫ থেকে ৪০-এর মধ্যে হলে স্বাস্থ্যরক্ষাশক্তি নড়বড়ে অবস্থায় রয়েছে। আর যোগফল ৪০-এর উপর হলে আপনার স্বাস্থ্যরক্ষাশক্তি সুন্দর ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে।

ঔষধি প্রশ্নমালা

১. আমি মনে করি ক্ষতি বা সমস্যা সৃষ্টি না করে দেহের স্বাভাবিক বিপাকক্রিয়া

নিয়ে টানাহেঁচড়া করা যাবে না।
২. ওষুধ সবসময়ই আমার জীবনের অংশ।
৩. আমি সবসময় ওষুধের প্রাকৃতিক বিকল্প অনুসন্ধান করি।
৪. যখনই সম্ভব ছোটখাট সমস্যার ক্ষেত্রে আমি ওষুধ এড়িয়ে চলি।
৫. আমার বাবা-মা সাধারণত ওষুধ এড়িয়ে চলেন।
৬. আমার প্রেসক্রিপশন ও সব ওষুধ রাখার জন্যে বড় বাক্সের প্রয়োজন হয়।
৭. ডাক্তারের কাছে আমার খুব কমই যাওয়ার প্রয়োজন হয়।
৮. সঠিক খাবার গ্রহণ করে আমি বদহজম এড়িয়ে চলি।
৯. ওষুধ খেয়ে সমস্যা আপাতভাবে দূর না করে আমি সবসময় শারীরিক সমস্যাকে গোড়া থেকে নির্মূল করতে চাই।
১০. ওষুধ ছাড়া থেকেছি এমন দিনের সংখ্যা আমার খুব কম।
১১. সুস্থ বোধ না করলে আমি সবসময়ই চাই আমার ডাক্তার আমাকে ওষুধ দিয়ে ভাল করে দিক।
১২. আমি বিশ্বাস করি, বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমার ওষুধের বেশি প্রয়োজন।
১৩. ঠাণ্ডা লাগলে ওষুধ খাওয়ার চেয়ে আমি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সুস্থ হয়ে ওঠাকে বেশি পছন্দ করি।
১৪. আমি মনে করি যে, প্রতিটি রোগ, অসুস্থতা বা ব্যথা দূর করার জন্যেই ওষুধ রয়েছে।
১৫. আমি কখনও ঘুমের ওষুধ খাই না।
১৬. আমি মনে করি যে, সাধারণ মানুষ ডাক্তারের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল।
১৭. আমি প্রায়ই বদহজমের জন্যে ওষুধ খেয়ে থাকি।
১৮. বাচ্চাদের ওষুধ একেবারেই কম খাওয়ানো উচিত বলে আমি মনে করি।
১৯. আমি মনে করি হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী, হেকেমী বা আকুপাংচারের মত বিকল্প চিকিৎসা সময়ের অপচয় মাত্র।
২০. আমার প্রায়ই মাথাব্যথা, কোমরে ব্যথা ইত্যাদি হয় এবং ওষুধ খেয়ে তা দূর করি।
২১. টেনশনগ্রস্ত হলে আমি ট্র্যাঙ্কুইলাইজার খাই।
২২. ডাক্তার আমাকের ওষুধের প্রেসক্রিপশন না দিলে আমি হতাশ ও মনঃক্ষুণ্ন হব।
২৩. আমার স্বাস্থ্যরক্ষা করা প্রাথমিকভাবে আমারই দায়িত্ব বলে আমি মনে করি।
২৪. আমি কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্যে প্রায়ই জোলাপ ব্যবহার করি।
২৫. আমি মনে করি লোকজন সাধারণভাবে অনেক বেশি ওষুধনির্ভর হয়ে পড়ছে।
২৬. বদহজম হতে পারে জেনেও সে খাবার খেতে আমার কোন দ্বিধা নেই, কারণ আমি হজমী ওষুধ খেয়ে সে অসুবিধা সবসময় দূর করি।
২৭. আমি জানি বিশ্রাম এবং প্রাকৃতিক সঙ্গ ওষুধের মতই গুরুত্বপূর্ণ।
২৮. আমি মনে করি সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে ওষুধ নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।
২৯. আমি বেশিরভাগ সময় সুস্থ বোধ করি এবং ওষুধের কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি না।
৩০. আমি মনে করি আমার জীবনের সাথে বছর যোগ করার চেয়ে বছরের সাথে প্রাণপ্রাচুর্য যোগ করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

স্কোরবোর্ড: ঔষধি প্রশ্নমালা				
১. (+) ৩	২. (—) ১	৩. (+) ৩	৪. (+) ১	৫. (+) ১
৬. (—) ২	৭. (+) ৩	৮. (+) ৩	৯. (+) ৩	১০. (—) ২
১১. (—) ৩	১২. (—) ১	১৩. (+) ২	১৪. (—)২	১৫. (+) ১
১৬. (+) ২	১৭. (—) ২	১৮. (+) ৩	১৯. (—) ২	২০. (—) ২
২১. (—) ২	২২. (—) ২	২৩. (+) ৩	২৪. (—)২	২৫.(+)২
২৬. (—) ৩	২৭. (+) ২	২৮. (+) ২	২৯. (+)৩	৩০. (+) ৩

এবার আপনার প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল লিখুন। যোগফল ২০-এর নিচে হলে আপনার নিজস্ব নিরাময়শক্তি ভারসাম্যহীন। আর যোগফল ২০ থেকে ৩০-এর মধ্যে হলে আপনার নিরাময়শক্তি নড়বড়ে। আর যোগফল ৩০-এর ঊর্ধ্বে হলে আপনার নিজস্ব নিরাময়শক্তি চমৎকার ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে।

নেশা বিষয়ক প্রশ্নমালা

১. আমি ধূমপান করি না।
২. আমি ধূমপান ছাড়তে চাই, কিন্তু পারি না।
৩. আমি আনন্দ করার জন্যে কখনও কোন ড্রাগ নেই না।
৪. আমি ধূমপান উপভোগ করি, তাই ধূমপান ছাড়তে চাই না।
৫. আমি চুরুট বা পাইপ খাই না।
৬. আমি সাদা জর্দা বা গুল খাই না।
৭. মদ আমার জীবনসঙ্গী নয়।
৮. রিলাক্স করার জন্যে আমার নিয়মিত মদ প্রয়োজন।
৯. প্রায় প্রতিদিন আমি এক/দুই পেগ এলকোহল পান করি।
১০. প্রতিদিন আমি একাধিকবার মাদকদ্রব্য গ্রহণ করি।
১১. কর্মক্লান্ত দিনের শেষে আমি মদ পছন্দ করি।
১২. আমার অধিকাংশ বন্ধুই মদ খায় না।
১৩. আমার অধিকাংশ বন্ধু ধূমপান করে না।
১৪. আমার অধিকাংশ বন্ধু ড্রাগ গ্রহণ করে না।
১৫. আমি কোন দিনই মাতাল অবস্থায় পড়ে যাইনি।
১৬. আমি মনে করি খাবার সময় একটু মদপান করলে কোন ক্ষতি নেই।
১৭. এক সপ্তাহে আমি ৩টির বেশি কোমল পানীয় পান করি।
১৮. আমি কোমল পানীয় পান করি না।
১৯. আমি দিনে ৩ কাপের বেশি চা বা কফি পান করি।
২০. কফি বা চা ছাড়াই আমি পরিষ্কার চিন্তা করতে পারি।
২১. নেশা হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে আমি কোমল পানীয় এড়িয়ে চলি।
২২. সামাজিক অনুষ্ঠানে আমি সবসময় কোমল পানীয় হাতে নিয়ে কথা বলি।
২৩. সপ্তাহের অধিকাংশ দিনই আমি চকলেট, আইসক্রীম ও মিষ্টি খাই।
২৪. আমার নিয়মিত প্রচুর চকলেট, আইসক্রীম বা মিষ্টি প্রয়োজন।
২৫. আমি নোনতা স্ন্যাক্স কম খাই এবং খাবারে কদাচিৎ কাঁচা লবণ ব্যবহার করি।
২৬. কখনও কখনও মদ খেয়ে আমি মাতাল হয়ে যাই।
২৭. আমি প্রায়ই ঘুমের ওষুধ খাই।
২৮. আমাকে সহজেই নেশায় পেয়ে বসে এবং নেশায় নিজেকে সমর্পণ করি।

২৯. নেশা করলেই আমার ব্যক্তিত্ব বদলে যায়।
৩০. কোন ব্যাপারেই আমার কোন নেশা নেই।

স্কোর বোর্ড: নেশা বিষয়ক প্রশ্নমালা

১. (+) ৩	২. (−) ৩	৩. (+) ৩	৪. (−) ৩	৫. (+) ২
৬. (+) ২	৭. (+) ৩	৮. (−) ৩	৯. (−) ২	১০. (−) ৩
১১. (−) ২	১২. (+) ২	১৩. (+) ৩	১৪. (+) ৩	১৫. (+) ৩
১৬. (−) ২	১৭. (−) ৩	১৮. (+) ৩	১৯. (−) ২	২০. (+) ৩
২১. (+) ৩	২২. (−) ২	২৩. (−) ২	২৪. (−)৩	২৫.(+)৩
২৬. (−) ৩	২৭. (−) ২	২৮. (−) ৩	২৯. (−)২	৩০. (+) ৩

এবার আপনার প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল লিখুন। যোগফল ১৫-এর নিচে হলে আপনার নেশানিবারণী শক্তি ভারসাম্যহীন অবস্থায় রয়েছে। আর ১৫ থেকে ২৫-এর মধ্যে হলে আপনার নেশানিবারণী শক্তি নড়বড়ে অবস্থায় রয়েছে। আর যদি প্রাপ্ত নম্বর ২৫-এর উপর হয় তাহলে আপনার নেশানিবারণী শক্তি পুরোপুরি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে।

আপনি ৫টি ভাগে প্রশ্নের জবাবে প্রাপ্ত ফল এবার এক সাথে যোগ করুন। যোগফল যদি ১০০-এর নিচে হয় তবে আপনার শারীরিক শক্তি একেবারে ভারসাম্যহীন। প্রাপ্ত নম্বর যদি ১০০ থেকে ১৬০-এর মধ্যে থাকে তবে শারীরিক শক্তি নড়বড়ে অবস্থায় রয়েছে। আর যদি প্রাপ্ত নম্বর ১৬০-এর উপর হয় তা হলে আপনার শারীরিক শক্তি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে এবং বলা যেতে পারে শারীরিকভাবে আপনি ভাল আছেন। (আপনার স্বাস্থ্যগত অবস্থান নিরূপণের এই প্রশ্নমালা ডা. এডওয়ার্ড টায়াব-এর গ্রন্থ অবলম্বনে কিছুটা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপে তৈরি করা হয়েছে।)

আপনার মন কতটুকু ভাল আছে?

মন ভাল তো সব ভাল। আপনি জানেন, ভাল থাকা হচ্ছে এমন এক ছন্দময় অস্তিত্ব যা প্রকৃতির আনন্দলোকে লীন। শরীর ও মনের সাবলীল গতিশীলতার অবস্থান বলে দেবে আপনার ভাল থাকার মাত্রা। এবার আপনার মানসিক অবস্থার গতিশীলতা নিরূপণের জন্যে ৩০টি করে পাঁচটি প্রশ্নমালায় মোট ১৫০টি প্রশ্ন দেয়া হলো। জবাব শুধুমাত্র হাঁ সূচক হলেই নম্বর দেয়া হবে। প্রতিটি প্রশ্নের জবাবে প্রাপ্ত নম্বর প্রতিটি প্রশ্নমালার শেষে স্কোর বোর্ডে যোগ চিহ্ন (+) অথবা বিয়োগ চিহ্ন (—) দিয়ে বসানো আছে। আপনার স্কোর যোগবোধক বা বিয়োগবোধক যে কোনটি হতে পারে। আপনার মন সংক্রান্ত ৫টি প্রশ্নমালা পূরণ করে স্কোর বোর্ড থেকে প্রাপ্ত নম্বর একসাথে যোগ করতে হবে। যোগফলই বলে দেবে আপনার মন ভাল আছে কি নেই।

আমরা এবার প্রশ্নমালায় চলে আসি। উত্তর হাঁ সূচক হলে প্রশ্নের পাশে (√) টিক চিহ্ন দিন। উত্তর না সূচক হলে কোন চিহ্ন দেয়ার প্রয়োজন নেই। স্মরণ রাখবেন, উত্তর হাঁ সূচক হলেই প্রশ্নের সংখ্যার পাশে দেয়া নম্বর যোগ বা বিয়োগ চিহ্ন অনুসারে যোগ বা বিয়োগ হবে।

সুখ সংক্রান্ত প্রশ্নমালা

১. আমি প্রতিদিন সকালে তরতাজা অনুভূতি নিয়ে জেগে উঠি।
২. আমার নিজেকে অবাঞ্ছিত, অবহেলিত ও ভুল বোঝাবুঝির শিকার মনে হয়।
৩. আমি আমার কাজের মাঝে আনন্দ পাই।
৪. আমার খুব ভাল বন্ধু আছে। আমি তাদের সাথে সময় কাটিয়ে আনন্দ পাই।
৫. আমি সব সময় দুশ্চিন্তা করি।
৬. আমি আমার পরিবার নিয়ে গর্বিত।
৭. জীবনের খুব সাধারণ জিনিসও আমাকে আনন্দ দেয়।
৮. বাজারে কেনাকাটা করতে আমার খুব ভাল লাগে।
৯. মাঝে মাঝেই আমার মাথা ব্যথা করে।
১০. আমি নিজেকে সুখী মনে করি।
১১. আমার মনে হয় পরিবেশ আমার বৈরী।
১২. নক্ষত্রখচিত আকাশ আমাকে মোহিত করে।
১৩. আমার সম্পত্তিই আমার কাছে সবকিছু।
১৪. আমার খুব ভাল ঘুম হয়।
১৫. সম্প্রতি আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হয়েছিল।
১৬. আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি।
১৭. বুড়ো হতে আমি ভয় পাই না।
১৮. আমি প্রায়ই হাসি এবং হাসতে ভালবাসি।
১৯. আমার পরিবার আমার দুঃখের কারণ।
২০. পৃথিবীতে এত খারাপ কিছু ঘটছে যে এখানে সুখী হওয়াটা কঠিন।
২১. আমি আমার প্রিয়জনকে প্রায়ই বুকে জড়িয়ে ধরি।
২২. যা করেছি এবং যা করা উচিত ছিল তা নিয়ে প্রায়ই দুশ্চিন্তায় ভুগি।

২৩. সবকিছু ঠিক ঠিক না চললে আমি মুষড়ে পড়ি।
২৪. মানুষ আনন্দ পাওয়ার জন্যে আমার কাছে আসে।
২৫. কোন কারণ ছাড়াই প্রায়ই আমি ক্ষুব্ধতা অনুভব করি।
২৬. আমার মনে হয়, জীবনসঙ্গী/সঙ্গিনীর সাথে আমার সম্পর্ক আরও সৎ হওয়া উচিত।
২৭. জয়ী হওয়ার চেয়ে সুখী হতে আমার বেশি ভাল লাগে।
২৮. আমার নিজের সবকিছু মানুষকে জানতে দিলে মানুষ আমাকে ভালবাসবে না।
২৯. আমি একটি গ্লাসকে আধা ফাঁকা মনে না করে অর্ধেক ভর্তি মনে করতে আনন্দ পাই।
৩০. আমি অনুভব করি যে জীবন হচ্ছে এক সুন্দর অভিযাত্রা।

স্কোর বোর্ড: সুখ সংক্রান্ত প্রশ্নমালা

১. (+) ৩	২. (—) ৩	৩. (+) ২	৪. (+) ৩	৫. (—)৩
৬. (+) ২	৭. (+) ২	৮. (—) ১	৯. (—) ১	১০. (+)৩
১১. (—) ৩	১২. (+) ৩	১৩. (—) ১	১৪. (+) ২	১৫. (—)৩
১৬. (+) ১	১৭. (+) ২	১৮. (+) ৩	১৯. (—) ২	২০. (—)২
২১. (+) ২	২২. (—) ২	২৩. (—) ২	২৪. (+) ২	২৫. (—)২
২৬. (+) ২	২৭. (+) ৩	২৮. (—) ২	২৯. (+) ২ .	৩০. (+)৩

এবার আপনার প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল লিখুন। যোগফল ২০ বা এর নিচে হলে আপনার সুখ নেই। যোগফল ২১ থেকে ৩০ এর মধ্যে হলে আপনার সুখ নড়বড়ে অবস্থায় রয়েছে। আর যোগফল ৩১ এর ওপর হলে আপনাকে মোটামুটি সুখী বলা যায়। উষ্ণ হৃদয় নিয়ে জীবনকে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারলেই সুখ পাওয়া যায়। সম্পত্তি থেকে সুখ উৎসারিত হয় না। সুখের উৎস হচ্ছে অন্তরের তৃপ্তি। ভালবাসার মত কেউ যত্ন নেয়ার মত কিছু, কোন প্রত্যাশা বা সৃষ্টি করার মত কিছু থাকলেই সুখের প্রবৃদ্ধি ঘটে।

মমতা সংক্রান্ত প্রশ্নমালা

১. যার সাহায্য প্রয়োজন তাকে সাহায্য করে আমি আনন্দ পাই।
২. কিউতে দাঁড়াতে হলে আমার মেজাজ বিগড়ে যায়।
৩. আমি সাধারণভাবে উষ্ণ ও সমবেদনা সম্পন্ন ব্যক্তি।
৪. আমি কাউকে ক্ষমা করতে পারি না।
৫. বাচ্চাদের রাস্তা পারাপারে আমি সবসময় সহযোগিতা করি।
৬. সুযোগ পেলেই অন্যের সমালোচনা করি।
৭. আমি সবাইকে একই স্রষ্টার সৃষ্টি বলে বিবেচনা করি।
৮. আমি অন্যদের সমস্যা সময় নিয়ে শুনি।
৯. অন্যের মুখে হাসি ফোটাতে পারলে আমি আনন্দ পাই।
১০. আমি বিশ্বাস করি, গ্রহীতা হওয়ার চেয়ে দাতা হওয়া অনেক ভাল।
১১. শিশুরা আমার কাছে এসে আনন্দ পায়।
১২. স্বেচ্ছাসেবায় আমি কদাচিৎ অংশগ্রহণ করি।
১৩. অন্যরা বলে তারা সবসময় আমার ওপর নির্ভর করতে পারে।
১৪. নিজের ভুল স্বীকার করা ও সেজন্যে দুঃখ প্রকাশ করা আমার জন্যে বেশ কঠিন।

১৫. আমি প্রায়ই দান করে থাকি।
১৬. আমি বিশ্বাস করি, প্রত্যেক মানুষ শুধু নিজের জন্যে।
১৭. আমার সমমর্মিতাবোধ প্রখর।
১৮. অন্যের কাছ থেকে ধন্যবাদ না পেলে আমি বিরক্ত বোধ করি।
১৯. অন্যদেরকে স্বাবলম্বী হওয়ার দীক্ষা দিতে আমি আনন্দ পাই।
২০. সবাই আমাকে শান্তিবাদী বলে জানে।
২১ আমার সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ অস্বস্তিবোধ করলে বা চিন্তাগ্রস্ত হলে আমি বুঝতে পারি।
২২. আমি অন্য মানুষের শরীরের ভাষা বুঝতে পারি।
২৩. দুর্গত মানুষকে আশার বাণী শোনাতে আমি ভালবাসি।
২৪. আমি বুঝতে পারি, কখন পরিবারের সদস্যদের প্রতি আমার বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে এবং তা দেই।
২৫. পরিবারের বাইরের কাউকে সাহায্য করাকে আমি অপছন্দ করি।
২৬. বস্তির কাছ দিয়ে গেলে আমি বিরক্ত হই।
২৭. আমার কোন জিনিসে আমি কাউকে ভাগ বসাতে দিতে চাই না।
২৮. আমি সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত।
২৯. আমি বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে ঘৃণা করি।
৩০. আমি জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সৃষ্টির সেবা করতে ভালবাসি।

স্কোর বোর্ড: মমতা সংক্রান্ত প্রশ্নমালা

১. (+) ৩	২. (—) ১	৩. (+) ৩	৪. (—) ৩	৫. (+)২
৬. (—) ২	৭. (+) ৩	৮. (+) ২	৯. (+) ২	১০. (+)৩
১১. (+) ২	১২. (—) ১	১৩. (+) ২	১৪. (—) ২	১৫. (+)৩
১৬. (—) ৩	১৭. (+) ৩	১৮. (—) ২	১৯. (+) ২	২০. (+)২
২১. (+) ২	২২. (+) ১	২৩. (+) ৩	২৪. (+) ২	২৫. (—)২
২৬. (—) ২	২৭. (—) ৩	২৮. (+) ৩	২৯. (+) ৩	৩০. (+)৩

এবার আপনার প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল লিখুন। যোগফল ২০-এর নিচে হলে আপনার মধ্যে মমতা ও ভালবাসা বলতে হবে শূন্যের কোঠায়। আর যোগফল ২১ থেকে ৩০ এর মধ্যে হলে আপনার মমতার ভিত্তি একেবারে নড়বড়ে। আর যোগফল ৩১ এর ওপর হলে বলতে হবে আপনার হৃদয়ে উষ্ণতা ও মমতা রয়েছে। আসলে স্নেহ, মমতা, ভালবাসা ও সমমর্মিতাই মানুষকে জন্তুর স্তর থেকে মানবিক স্তরে উন্নীত করে।

জ্ঞান সংক্রান্ত প্রশ্নমালা

১. আমি মনে করি সমমর্মিতা ও চরিত্র জ্ঞানের মতই গুরুত্বপূর্ণ।
২. আমি প্রায়ই লাইব্রেরিতে যাই।
৩. আমার আর নতুন কিছু জানার বা শেখার প্রয়োজন নেই।
৪. আমি যা জানি না তা জানার চেষ্টা করে আমি আনন্দ পাই।
৫. সমকালীন ঘটনাবলী সম্পর্কে আমার জ্ঞান খুব কম।
৬. আমি প্রায়ই অভিধানে শব্দের অর্থ খুঁজে বের করি।
৭. মারদাঙ্গা ছবির চেয়ে আমি সৃজনশীল চলচ্চিত্র বেশি পছন্দ করি।
৮. চিরায়ত সাহিত্য পড়তে আমি আনন্দ পাই।
৯. আমি বিশ্বাস করি, শিক্ষা শুধু তরুণদের জন্যেই।

১০. প্রতিদিন কিছু না কিছু পড়া আমার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ।
১১. আমি সুর ও সঙ্গীত পছন্দ করি।
১২. আমি অবসর সময় টেলিভিশন দেখে কাটাই।
১৩. আমি জাদুঘরে যেয়ে আনন্দ পাই।
১৪. বইয়ের দোকানে যাওয়া আমার জন্যে আনন্দের ব্যাপার।
১৫. আমি কদাচিৎ কিছু পড়ি।
১৬. নতুন স্থানে ভ্রমণ করতে আমি আনন্দ পাই।
১৭. প্রকৃতির রূপ, রং ও শব্দ আমার কাছে মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়।
১৮. আমি সাধারণত টেলিভিশনের শিক্ষা বা জ্ঞানমূলক অনুষ্ঠানই দেখে থাকি।
১৯. সৃজনশীল নাটক ও সঙ্গীতানুষ্ঠানে যেতে পারলে আমি আনন্দিত হই।
২০. আমি মনে করি, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যা স্থায়ী/অস্থায়ী কল্যাণ ও অকল্যাণের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করতে শেখায়।
২১. আমার একাধিক সুন্দর হবি রয়েছে।
২২. কোন শিক্ষা বা ট্রেনিংই আমাকে বদলাতে পারবে না।
২৩. নতুন দায়িত্ব গ্রহণ ও নতুন দক্ষতা অর্জন করতে আমি আনন্দ পাই।
২৪. নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও ব্যক্তিচরিত্র আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
২৫. আমি সাধারণত ব্যর্থতাকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ হিসেবে মনে করি।
২৬. সুন্দর হাতের লেখা আমি পছন্দ করি।
২৭. আমি সবসময় বিজ্ঞ পরামর্শদাতা অনুসন্ধান করি।
২৮. আমি মনে করি, যে কোন বয়সে যে কারও কাছ থেকেই শেখা যায়।
২৯. বয়সে আমার চেয়ে ছোট এমন কারও কাছ থেকে আমি কিছু শিখতে সংকোচ বোধ করি।
৩০. জ্ঞান অর্জন করে জ্ঞান দান করাকে আমি সর্বোত্তম দান মনে করি।

স্কোর বোর্ড: জ্ঞান সংক্রান্ত প্রশ্নমালা

১. (+) ৩	২. (+) ২	৩. (—) ৩	৪. (+) ২	৫. (—)২
৬. (+) ২	৭. (+) ২	৮. (+) ৩	৯. (—) ২	১০. (+)৩
১১. (+) ২	১২. (—) ৩	১৩. (+) ২	১৪. (+) ২	১৫. (—)২
১৬. (+) ৩	১৭. (—) ২	১৮. (+) ২	১৯. (+) ২	২০. (+)৩
২১. (+) ৩	২২. (—) ৩	২৩. (+) ৩	২৪. (+) ৩	২৫. (+)৩
২৬. (+) ২	২৭. (+) ৩	২৮. (+) ৩	২৯. (—) ৩	৩০. (+)৩

এবার আপনার প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল লিখুন। যোগফল ২০-এর নিচে হলে আপনার জ্ঞানশক্তি একেবারে কম। যোগফল ২১ থেকে ৩০-এর মধ্যে হলে আপনার জ্ঞানশক্তি একেবারে নড়বড়ে অবস্থায় রয়েছে। আর যোগফল ৩১-এর ওপর হলে আপনার জ্ঞানশক্তি গতিশীল অবস্থায় রয়েছে। আপনি শিখতে পারবেন। আর শেখার মধ্য দিয়েই মানুষ জ্ঞানবান হয়, চরিত্র গঠন করতে পারে। আপনি শেখার ক্ষমতাকে গতিশীল রাখলেই জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন, দক্ষতা বাড়াতে পারবেন, সচেতন হতে পারবেন জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে। শিক্ষার মধ্য দিয়েই আপনার অনুসন্ধিৎসা তৃপ্তি পাবে আর নিজের পরিপূর্ণ বিকাশ করতে পারবেন।

আত্মমর্যাদা সংক্রান্ত প্রশ্নমালা

১. আমি জানি, আমার সামনে যাই আসুক আমি মোকাবিলা করতে পারব।

২. সামাজিক অনুষ্ঠানে আমি অস্বস্তিবোধ করি এবং তা এড়িয়ে চলি।
৩. পরিবর্তন অত্যন্ত আনন্দদায়ক হতে পারে বলে আমি মনে করি।
৪. আমি প্রায়ই নিজেকে অযোগ্য মনে করি।
৫. আমাকে দেখতে ভাল দেখায় না বলে আমি অস্বস্তি বোধ করি।
৬. আমার অর্জিত সাফল্য নিয়ে আমি গর্বিত।
৭. আমার অনেক দোষ রয়েছে যা আমার সুখের অন্তরায়।
৮. আমার কোন প্রশ্ন বা পরামর্শ থাকলে যে কোন সভায় আমি তা উত্থাপন করতে পারি।
৯. আমি কখনও আমার মতামত ব্যক্ত করি না।
১০. কারও সাথে কথা বলার সময় আমি প্রায়ই তার চোখের দিকে তাকাই।
১১. কোথাও কোন বক্তৃতা দিতে হলে আমি সেখান থেকে চলে আসার জন্যে যা করতে হয় তাই করব।
১২. চাকরি একটা না থাকলে আর একটা চাকরি পেতে আমার বেগ পেতে হবে না।
১৩. গুরুত্বপূর্ণ মানুষের সামনে গেলে আমি নার্ভাস হয়ে যাই।
১৪. আমি নিজের ব্যাপারে খুবই খুঁতখুঁতে।
১৫. যে কোন সভায় বক্তব্য রাখতে আমি আনন্দ পাই।
১৬. আমার বসের সাথে আমার সম্পর্ক অত্যন্ত ভাল।
১৭. আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, অন্যরা আমাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করছে।
১৮. আমি সবসময় হাসিমুখে কথা বলি।
১৯. অল্পতেই আমার আত্মবিশ্বাস নড়বড়ে হয়ে যায়।
২০. আমি একজন ভাল শ্রোতা।
২১. আমার মনে হয়, অন্যরা আমার চেয়ে বেশি জানে, তাই আমি কোন ব্যাপারেই কথা বলতে চাই না।
২২. আমি প্রায়ই বোকার মত কথা বলে ফেলি।
২৩. আমি মনে করি, একজন মানুষ দুনিয়াকে বদলাতে পারে না।
২৪. অন্যদের সাহায্য করতে আমি ভালবাসি।
২৫. নিজের সম্পর্কে ভাল অনুভূতি আনার জন্যে অন্যদের কাছ থেকে আমার প্রচুর স্বীকৃতি প্রয়োজন।
২৬. আমার বাবা-মা বলেছেন আমি কোনদিনই কিছু করতে পারব না। আর তারা ঠিকই বলেছেন।
২৭. কাজ করার সময় আমি সবার মাঝে প্রশংসা ছড়িয়ে দিতে চাই।
২৮. অপরিচিত লোকদের সামনে আমি অস্বস্তি বোধ করি।
২৯. অন্যদের সাথে মিলে কাজ করতে আমি আনন্দ পাই।
৩০. আমি জানি আমি নিখাদ নই। কিন্তু আমি যা, তা নিয়েই আমি ভাল চলতে পারছি।

স্কোর বোর্ড: আত্মমর্যাদা সংক্রান্ত প্রশ্নমালা

১. (+) ৩	২. (−) ১	৩. (+) ২	৪. (−) ২	৫. (−)২
৬. (+) ৩	৭. (−) ৩	৮. (+) ২	৯. (−) ২	১০. (+)২
১১. (−) ১	১২. (+) ৩	১৩. (−) ১	১৪. (−) ২	১৫. (+)১
১৬. (+) ২	১৭. (−) ১	১৮. (+) ২	১৯. (−) ২	২০. (+)২
২১. (−) ২	২২. (−) ২	২৩. (−) ২	২৪. (+) ২	২৫. (−)২
২৬. (−) ৩	২৭. (+) ২	২৮. (−) ১	২৯. (+) ১	৩০. (+)৩

এবার আপনার প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল লিখুন। যোগফল ১৫ বা তার নিচে হলে আপনার আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ খুব কম। আর যোগফল ১৫ থেকে ২৫ এর মধ্যে হলে আপনার আত্মবিশ্বাসের শক্তি বেশ নড়বড়ে অবস্থায় রয়েছে। আর যোগফল ২৬ বা তার ওপর হলে আপনাকে আত্মবিশ্বাসী ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে অভিহিত করা যায়। আত্মমর্যাদাবোধ আসে আত্মবিশ্বাস থেকে। নিজের অন্তরতম শক্তির ওপর বিশ্বাসই মানুষকে মুক্ত করে ভয় থেকে, শঙ্কা থেকে। আত্মবিশ্বাসই মানুষকে দেয় পরিপূর্ণ স্বাধীনতা।

নৈতিকতা সংক্রান্ত প্রশ্নমালা

১. ভুল করলে আমি তা অম্লান বদনে স্বীকার করি।
২. যদি সবাই প্রতারণা করে তবে আমিও প্রতারণা করতে পারি।
৩. আমি বিশ্বাস করি, আমার ত্রুটিগুলো দূর করা উচিত।
৪. নিজের বায়োডাটা তৈরি, চাকরির আবেদনপত্রে বা ইন্টারভিউতে আমি মিথ্যা বলতে পারি।
৫. যদি কেউ আমাকে কোন গোপন কথা বলে তবে আমি তা কখনও প্রকাশ করব না।
৬. আমি কোন কিছু চুরি করি না।
৭. আমার নীতি হচ্ছে, ধরা না পড়লে সব কিছুই ঠিক।
৮. অন্যরা আমার সততায় বিশ্বাস করে।
৯. আমি আমার সন্তানকে কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল তা শেখাতে চেষ্টা করি।
১০. আমার বস্ যদি অসৎ কিছু করতে বলে তাহলে আমি তা করব না।
১১. যদি কেউ ভুল করে আমাকে বেশি দিয়ে ফেলে, তবে আমি তা রেখে দেই।
১২. এই দুনিয়ায় ন্যায়-অন্যায় নিয়ে চিন্তা করা সময়ের অপচয় মাত্র।
১৩. ন্যায় ও অন্যায়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হলে আমি সবসময় ন্যায়ের পক্ষেই সিদ্ধান্ত নেব।
১৪. আমি যদি রাস্তায় টাকা ভর্তি মানিব্যাগ কুড়িয়ে পাই তবে আসল মালিককে খুঁজে বের করার জন্যে সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা চালাব।
১৫. খরচের বিল বানানোর সময় অফিসে আমি অতিরিক্ত বিল বানিয়ে থাকি।
১৬. কেউ ভুল করে আমাকে বেশি টাকা দিয়ে ফেললে আমি তা তাকে ফেরত দেব।
১৭. আমার ছেলে/মেয়ে যদি কোন দোকান থেকে কিছু চুরি করে তবে আমি দোকানিকে তা ফেরত দিয়ে ক্ষমা চাইব।
১৮. আমি যদি রাস্তায় মানিব্যাগে ১০ টাকাও কুড়িয়ে পাই তবে মালিককে খুঁজে বের করার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাব।
১৯. আমি মনে করি, প্রয়োজনে নৈতিক মূল্যবোধ পাল্টানো যায়।
২০. বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রচুর অর্থ রয়েছে। অতএব ধরা না পড়লে সেখান থেকে টাকা মারা দোষের কিছু নেই।
২১. পৃথিবীতে প্রচুর অন্যায়কারী ও অনৈতিক লোক রয়েছে। এখানে নীতিবান হওয়ার কোন অর্থ হয় না।
২২. আমি কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করি না।
২৩. আমি ভাল করতে চাই, ভাল থাকতে চাই।
২৪. কষ্ট করার চেয়ে চুরি করা, প্রতারণা করা অনেক ভাল

২৫. কোন চুক্তি করলে আমি চুক্তি অনুসারেই কাজ করব।
২৬. ফাইল আটকে ঘুষ নিতে আমার কোন সংকোচ নেই।
২৭ অন্যের কাজ করে দেয়ার পর সে খুশি হয়ে কিছু দিলে আমি তা গ্রহণ করি।
২৮. অধীনস্থদের অতিরিক্ত খাটিয়ে শুধু নিজের সুবিধা করে নেয়াকে আমি সঙ্গত মনে করি।
২৯. ইন্দ্রিয় সুখ লাভের কোন সুযোগ আমি হাত ছাড়া করতে চাই না।
৩০. আমি বিশ্বাস করি চরিত্র নষ্ট হলে সব কিছুই নষ্ট হয়ে যায়।

স্কোর বোর্ড: নৈতিকতা সংক্রান্ত প্রশ্নমালা

১. (+) ৩	২. (−) ৩	৩. (+) ২	৪. (−) ৩	৫. (+)২
৬. (+) ৩	৭. (−) ৩	৮. (+) ২	৯. (+) ৩	১০. (+)৩
১১. (−) ৩	১২. (−) ৩	১৩. (+) ৩	১৪. (+) ৩	১৫. (−)৩
১৬. (+) ৩	১৭. (+) ৩	১৮. (+) ৩	১৯. (−) ২	২০. (−)৩
২১. (−) ৩	২২. (+) ৩	২৩. (+) ২	২৪. (−) ৩	২৫. (+)২
২৬. (−) ৩	২৭. (+) ১	২৮. (−) ৩	২৯. (−) ৩	৩০. (+)৩

এবার আপনার প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল লিখুন। যোগফল ২৫ এর নিচে হলে আপনার মধ্যে নৈতিকতার শক্তি একেবারেই নেই। আর যোগফল ২৬ থেকে ৪০ এর মধ্যে হলে আপনার নৈতিকতার শক্তি একেবারেই নড়বড়ে অবস্থায় রয়েছে। আর যোগফল ৪১ এর ওপরে হলে আপনার নৈতিক বল অত্যন্ত গতিশীল অবস্থায় রয়েছে। আসলে নৈতিকতা হচ্ছে নিজের হৃদয় ও বিবেকের কণ্ঠস্বরকে অনুসরণ করা। বিবেকের কণ্ঠস্বরই মানুষকে ভাল-মন্দের পার্থক্য করতে শেখায়। নৈতিকতা হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনে আত্মার প্রতিধ্বনির অনুসরণ। আর এই অনুসরণই মানুষকে মহিমান্বিত জীবন প্রদান করে।

আপনার পরিবার হোক সুখী পরিবার

পরিবার সুখী না হলে ব্যক্তির জীবনে সুখের সম্ভাবনা কমে যায়। পরিবারের মাঝে অবস্থান করে পারিবারিক পরিমণ্ডলের অশান্তি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা কঠিন ব্যাপার। তাই ব্যক্তিজীবনে সুখ চাইলে পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক সুখ সৃষ্টির জন্য আপনাকে উদ্যোগী হতে হবে। আপনি উদ্যোগী হলে পারিবারিক সুখ-শান্তি সহজেই অর্জন করতে পারবেন। এজন্যে বিজ্ঞজনের কিছু উপদেশ আপনার পথ চলাকে অনেক সহজ করে দিতে পারে।

১. জীবনসঙ্গী/সঙ্গিনী সম্পর্কে সুন্দর মমতাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করুন। সবসময় হাসিমুখে কথা বলুন।

২. পারস্পরিক অধিকারকে স্বীকার করে নিন।

৩. দাম্পত্য সম্পর্ককে শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখুন।

৪. দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে সবসময় স্নেহ-মমতা ও ভালবাসায় আপ্লুত আচরণ করুন।

৫. বাবা-মাকে ঘরের হৃদয় হিসেবে বিশ্বাস করুন এবং তাঁদেরকে মমতার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে ভাবুন।

৬. আপনার জীবনে বাবা-মায়ের দোয়াকে গুরুত্ব দিন এবং তাঁদের সুখ-শান্তি নিশ্চিত করুন।

৭. আপনার জীবনসঙ্গী/সঙ্গিনীকে একজন উপযুক্ত ভালমানুষ হিসেবে ভাবুন।

৮. মনে করুন, মানুষ হিসেবে অত্যন্ত ভালমানুষে রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা আপনার জীবনসঙ্গী/সঙ্গিনীর মধ্যে রয়েছে।

৯. আপনার জীবনসঙ্গী/সঙ্গিনীর ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলী উন্নয়নে আগ্রহ সহকারে অংশ নিন।

১০. পারস্পরিক ইতিবাচক ও ভাল ধারণাগুলোকে লালন করুন। পারস্পরিক মমতাকে গঠনমূলকভাবে প্রয়োগ করুন।

১১. পারস্পরিক ভালবাসার কথা প্রতিদিন কয়েকবার করে বলুন।

১২. জীবনসঙ্গী/সঙ্গিনীর জন্মদিন মনে রাখুন। তার পছন্দনীয় উপহার দিয়ে তাকে অবাক করুন।

১৩. বিয়ের তারিখ ভুলে যাবেন না। বিয়ে বার্ষিকী বা যে কোন উৎসবে সবসময় আপনার সামর্থ্যের মধ্যে উপহার দিন।

১৪. আপনার জীবনসঙ্গী/সঙ্গিনীর যোগ্যতাকে প্রশংসা করুন। পরিবারে তার প্রতিটি অবদানকে অকপটে স্বীকার করুন।

১৫. দাম্পত্য ও পারিবারিক সম্পর্ককে সব সময় ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক হতে দিন।

১৬. আপনার এবং আপনার জীবনসঙ্গী/সঙ্গিনীর চরিত্রবৈশিষ্ট্যে এবং মানসিক, সৃজনশীল ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে যে মিল রয়েছে তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করুন এবং এই বিষয়গুলোকে সম্মিলিতভাবে বিকশিত করার চেষ্টা করুন।

১৭. আপনার জীবনসঙ্গী/সঙ্গিনীকে বুঝতে চেষ্টা করুন এবং সুসম্পর্ক সৃষ্টি করুন। এজন্য ভাল শ্রোতা হোন। আপনি যত মনোযোগ দিয়ে শুনতে পারবেন, তত বেশি আপনি তাকে বুঝতে পারবেন।

১৮. আপনার জীবনসঙ্গী/সঙ্গিনীর সব গুণ ও দোষসহই তাকে গ্রহণ করুন। কখনোই তার সাথে অন্যদের তুলনা করবেন না। যদি তুলনা করতেই হয় তাহলে

তার অতীতের সাথে বর্তমানকে তুলনা করুন। তার মধ্যে যে গুণগুলো বিকশিত হয়েছে বা যে ভাল পরিবর্তন এসেছে সবসময় তার প্রশংসা করুন।

১৯. আপনার জীবনসঙ্গী/সঙ্গিনীর মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি, শখ, পছন্দ, প্রত্যাশা জানতে চেষ্টা করুন এবং আপনার সামর্থ্য অনুসারে তার সেই শখ, পছন্দ ও প্রত্যাশা পূরণ করুণ।

২০. জীবনসঙ্গী/সঙ্গিনীর ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে শ্রদ্ধা করতে শিখুন।

২১. ছোটখাট বিষয় নিয়ে বিতর্ক এড়িয়ে চলুন।

২২. কোন ব্যাপারে মতপার্থক্য সৃষ্টি হলে সেটা কীভাবে দূর করা যায় তার যথোপযুক্ত পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে পরামর্শ দিন।

২৩. আপনি যে কথাই বলুন না কেন—তা শ্রোতার মনে পক্ষে বা বিপক্ষে ছাপ ফেলে। তাই সবসময় সুন্দর ও শ্রদ্ধাপূর্ণ বাক্য ব্যবহার করুন। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও কটূক্তি এড়িয়ে চলুন।

২৪. দাম্পত্য সুখ-শান্তির মূল চাবি হচ্ছে বিশ্বস্ততা। তাই দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে সবসময় বিশ্বস্ত থাকুন।

২৫. পরিবারের ব্যবস্থাপনা সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ। অতএব পরিবারের প্রতিটি সদস্যের কর্তব্য ও দায়িত্বের সীমারেখা জানুন। আপনার সিদ্ধান্ত ও উদ্যোগ সবসময়ই অন্যদের সাথে সমন্বিতভাবে গ্রহণ করুন।

২৬. সাধারণ নিয়ম হিসেবে পরিবারের ব্যবস্থাপনা ও চূড়ান্ত দায়িত্ব পরিবারের কর্তার উপর বর্তায়। পারিবারিক ব্যাপারে যতদূর সম্ভব স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক পরামর্শ অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত এবং পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে একে অন্যের অধিকারকে শ্রদ্ধা করা উচিত।

২৭. সুখী দাম্পত্যজীবনের জন্য ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের চেয়েও পরিবারের কল্যাণচিন্তাকে অগ্রাধিকার দিন। বৃহত্তর স্বার্থের কারণে প্রয়োজনে নিজস্ব পছন্দের প্রশ্নে নমনীয়তা প্রদর্শন করুন।

২৮. জীবনসঙ্গী/সঙ্গিনীর সাথে আপনার যুক্তিতর্কে একগুঁয়েমি প্রদর্শন করবেন না, এবং নিজের মত করে কাজ করবেন না। জীবনসঙ্গী/সঙ্গিনীর প্রতি মমতা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করুন, এবং যে যে রকম তাকে সেভাবে গ্রহণ করুন।

২৯. জীবনসঙ্গী/সঙ্গিনীর উপর কর্তৃত্ব করার চেষ্টা করবেন না। পরস্পরকে যুক্তিসঙ্গত স্বাধীনতা প্রদান করুন।

৩০. প্রতিটি মানুষই আলাদা। স্বামী-স্ত্রীও দু'জন পৃথক মানুষ। বুদ্ধি, যোগ্যতা এবং দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যে উভয়ই আলাদা। অতএব আপনি আপনার স্বামী/স্ত্রীর বৈশিষ্ট্যের সাথে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করুন এবং এমনভাবে অগ্রসর হোন যাতে আপনাদের ব্যক্তিত্ব পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হয়ে দাঁড়ায়।

৩১. আপনার স্বামী/স্ত্রীর চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করবেন না। বিবাহিত জীবনে আপনারা হচ্ছেন অংশীদার। সবসময় নিশ্চিত হোন যে আপনার ডিগ্রী, সামাজিক মর্যাদা ও বিত্তবৈভব যেন আপনাকে বিনয়ী রাখে। আপনার সাফল্যের ব্যাপারে আপনার স্বামী/স্ত্রীর কোন ভূমিকা থাকলে তা অকপটে স্বীকার করুন।

৩২. বিবাহিত জীবনে অংশীদারিত্বের মূল নীতিতে বিশ্বাস করুন। নিজেই সবকিছু একা করতে যাবেন না। বিয়ে হচ্ছে নারী এবং পুরুষের মধ্যে এক অংশীদারিত্বের বন্ধন। এই অংশীদারিত্বে তারা নিজেদের আত্মা, হৃদয়, মমতা, অনুভূতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা সবকিছুই বিনিয়োগ করে। তাই ঐক্যমত ও সহযোগিতার জন্যে আপনি সর্বাপেক্ষা সুন্দর মানবীয় অংশীদারিত্বের আচরণ করুন।

৩৩. একজন সফল ব্যবস্থাপক সবসময় পরিবারের সকল সদস্যের সম্ভাবনা ও যোগ্যতাকে উৎসাহিত ও স্বীকার করে এবং তাদেরকে পরিবারের মূল লক্ষ্য অর্জনে

সমন্বিতভাবে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

৩৪. সমসময় আপনার জীবনসঙ্গী/সঙ্গিনীর বয়স, পেশাগত-প্রয়োজন, সামাজিক মর্যাদা, অর্থনৈতিক সামর্থ্য, দৈহিক ও মানসিক অবস্থা খেয়াল রাখুন এবং তার ঘরোয়া ও বাইরের তৎপরতায় সহযোগিতা করুন। বিশেষভাবে অসুস্থতা, গর্ভাবস্থা, শিশুপালন ইত্যাদি ক্ষেত্রে আপনাদের পরস্পরের প্রতি বিশেষ যত্নবান হতে হবে।

৩৫. সমসময় মনে রাখুন, ঘরোয়া কাজগুলো বাইরে অর্থনৈতিক কর্ম-কাণ্ডের চেয়ে কোন অবস্থাতেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ঘরোয়া কাজের প্রতি গুরুত্ব দিলে জীবনসঙ্গী/সঙ্গিনীর উদ্যম ও উৎসাহ বেড়ে যাবে। এবং তা আপনার দাম্পত্য জীবনের ভিত্তিকে শক্তিশালী করবে।

৩৬. বাইরে অত্যধিক ব্যস্ততার কারণে পারিবারিক কাজে স্ত্রীকে সহযোগিতা করতে না পারলে সেজন্য স্ত্রীর কাছে দুঃখপ্রকাশ করুন এবং যখনই সম্ভব তার কাজে সহযোগিতা করুন।

৩৭. পরিবারের পিতৃতান্ত্রিকতা বা মাতৃতান্ত্রিকতা কোনটাই অনুসৃত হওয়া উচিত নয়। বরং তা সত্য ও ন্যায় দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত। স্বামী বা স্ত্রীর মত অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়া উচিত নয়। শুধুমাত্র সত্যকেই গ্রহণ করা উচিত এবং সত্য যদি আপনার বিপক্ষেও যায় তবুও তা অকাতরে মেনে নেয়া উচিত।

৩৮. পরিবারের কারও কানকথা দিয়ে প্রভাবিত হবেন না। সত্য অনুসন্ধান নিশ্চিত করুন। প্রতিটি তথ্য সংগ্রহ করুন, সেগুলো বিচার করুন ও সিদ্ধান্ত নিন। এভাবে চললে আপনার ভুল করার সম্ভাবনা কম থাকবে।

৩৯. হাসি-আনন্দ-কৌতুকে দিনের সময়গুলো ভরে রাখুন। স্বামী/স্ত্রী কোন কারণে মনঃক্ষুণ্ণ হলে কোন না কোনভাবে তার মুখে হাসি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করুন। আপনার কোন কষ্ট বা বিফলতা পরিবারের অন্য সদস্যদের সুখ-শান্তি যাতে ভঙ্গ না করে সেদিকে খেয়াল রাখুন।

৪০. বর্তমানকে নিয়ে বাঁচুন। অতীতে আপনার কী কষ্ট ছিল বা কী পাননি সেটা নিয়ে চিন্তা করে বর্তমানকে বিষিয়ে তুলবেন না। বর্তমানকে আনন্দময় করে তুলুন এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করুন। বর্তমান নিয়ে আনন্দে থাকুন।

৪১. অন্যদের দুঃখকষ্ট থেকে শিক্ষাগ্রহণ করুন। সফল মানুষদের অভিজ্ঞতা থেকে ফায়দা হাসিল করুন। নিঃসন্দেহে তা আপনার সুখ বাড়িয়ে দেবে।

৪২. আপনার স্বামী/স্ত্রীর কাছ থেকে আপনার প্রত্যাশাকে সবসময় যুক্তিসঙ্গত সীমার মধ্যে রাখুন। আপনার যুক্তিসঙ্গত প্রত্যাশা পারস্পরিক সমঝোতা, শ্রদ্ধা ও আনন্দ বাড়িয়ে দেবে।

৪৩. বিয়ে হচ্ছে দেয়া-নেয়ার ব্যাপার। দায়িত্ব যেমন আছে, কর্তব্যও রয়েছে তেমনি। পেতে যখন চাইবেন তখন দিতেও হবে। তাই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে সময় নষ্ট করবেন না। ভুলে যান এবং ক্ষমা করুন। হৃদয়ের উদারতা দিয়ে দাম্পত্যজীবনের শান্তি নিশ্চিত করুন।

৪৪. স্বামী/স্ত্রীর ব্যাপারে অহেতুক খুঁতখুঁতে হবেন না। কঠোর ভাষায় কখনও তার ভুল ধরতে যাবেন না। যে কোন ভুল আপনি সুন্দরভাবে সময় ও সুযোগমত বুঝিয়ে দিতে পারেন। এতে পারিবারিক শান্তি বাড়বে।

৪৫. আপনি আপনার জীবনসঙ্গী/সঙ্গিনীর সংশোধনের জন্য গঠনমূলক সমালোচনা করতে চাইলে প্রথমে তার গুণাবলী বা তার চরিত্রের ভাল দিকগুলো উল্লেখ করুন। তা হলেই আপনি সহজেই তাকে প্রভাবিত করতে পারবেন।

৪৬. আপনাদের পারস্পরিক মানবীয় ও দাম্পত্য সম্পর্কের পবিত্রতা রক্ষা করার

জন্য পারিবারিক কোন গোপন তথ্য কখনও প্রকাশ করবেন না। আপনার জীবনসঙ্গী/সঙ্গিনীর আস্থা অর্জন করুন। তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকুন।

৪৭. দাম্পত্য কোন বিরোধ মীমাংসার জন্যে কখনও বাইরের কাউকে ডাকবেন না। নিজেরাই বিরোধ মীমাংসার উপায় বের করে নিন। তাহলেই দেখবেন সহজেই বিরোধের অবসান হয়েছে।

৪৮. কর্তৃত্বপরায়ণ স্বামী বা স্ত্রী হওয়ার চেষ্টা করবেন না। পারিবারিক সম্পর্ক উন্নয়নে বা সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার প্রয়োজনে সহজভাবে পরামর্শ দিন।

৪৯. বাসায় যখন ফিরে আসবেন তখন পেশাগত সব ঝামেলা অফিসেই রেখে আসবেন। আপনার পেশাগত দুশ্চিন্তা বা সমস্যা যেন পারিবারিক শান্তিকে বিঘ্নিত না করে।

৫০. আপনার জীবনসঙ্গী/সঙ্গিনীর আনন্দ ও উদ্দীপনা বৃদ্ধির জন্য পরিবারের নিয়ম-কানুন ভালর দিকে পরিবর্তন করুন। পরিবর্তন ও অগ্রগতির সবগুলো সুযোগকেই কাজে লাগান। ভবিষ্যৎ নিয়ে অহেতুক চিন্তাভাবনা করবেন না। কারণ যা নিয়ে আপনি দুশ্চিন্তা করছেন তা হয়তো বাস্তবে কোনদিনই ঘটবে না। মাঝখান থেকে দুশ্চিন্তা করে আপনি আপনার বর্তমানের সুখকে নষ্ট করছেন। আর ভবিষ্যৎ নিয়ে অহেতুক দুশ্চিন্তা আপনাকে শুধু অকালে বুড়িয়ে দেবে।

৫১. আপনার জীবনসঙ্গী/সঙ্গিনীর সাথে কথা বলার জন্য সময় বের করে নিন। পরিবারের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তার সাথে খোলামেলা ও মমতাপূর্ণ আলোচনা করুন। নিয়মিত এই আলোচনা অব্যাহত রাখুন। আপনার যত ব্যস্ততাই থাক না কেন এই আলাপের জন্য সময় বের করে নিতে ভুলবেন না।

৫২. পারিবারিক জীবনের সবকিছুই পরিকল্পিতভাবে করুন। এতে আপনার ঝামেলা কমে যাবে। আপনি নিজের ও পরিবারের সদস্যদের সবার কর্মক্ষমতাকে সুন্দরভাবে কাজে লাগাতে পারবেন।

৫৩. ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদ আপনার জীবনের দার্শনিক ভিত্তি হওয়া উচিত। এই আশাবাদী মনোভাবই পারিবারিক শান্তিকে নিশ্চিত করতে পারে।

৫৪. পরিবারের সবাই মিলে মননশীল ও জ্ঞানগর্ভ বইপত্র নিয়ে আলোচনায় বসুন। সফল মানুষদের জীবনকাহিনী আলোচনা করুন। এতে পরিবারের সদস্যদের জ্ঞান যেমন বাড়বে তেমনি আপনার আত্মবিশ্বাসও বাড়বে। সফল মানুষেরা কিভাবে জীবনের কঠিন পথ পাড়ি দিয়েছেন তা জেনে তাঁদের সেই অভিজ্ঞতাকে আপনি আপনার জীবনে কাজে লাগাতে পারেন।

৫৫. পরিবারের সদস্যদের জন্য ব্যস্ততার মাঝখান থেকেও সময় বের করে নিন। যখনই সময় পান তাদের নিয়ে ধর্মীয়, বৈজ্ঞানিক, সৃজনশীল ও মননশীল আলোচনা-অনুষ্ঠানে যোগ দিন। এতে আপনার পরিবারও মননশীল হয়ে উঠবে।

৫৬. আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের কাছে সপরিবারে বেড়াতে যান।

৫৭. যখনই সুযোগ পান সবাইকে নিয়ে ভ্রমণ করুন।

৫৮. নিজের বাসস্থান ও বাড়িকে আকর্ষণীয় করে তুলুন। নিজের ও পরিবারের সদস্যদের নামে গাছ লাগান, নিয়মিত সেগুলোর যত্ন নিন। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও উদ্বুদ্ধ করুন সবার নামে গাছ লাগাতে এবং তার যত্ন নিতে। বিভিন্ন জনের নামে রোপিত এই গাছের যত্ন নেয়ার সময় যিনি যত্ন নিচ্ছেন তাঁর মনে তাদের সম্পর্কে মমতা বৃদ্ধি পাবে। এভাবেই প্রকৃতি সুন্দর হওয়ার সাথে সাথে আপনার পারিবারিক সম্পর্কও সুন্দর হয়ে উঠবে।

৫৯. আপনি ধর্মবিশ্বাসী হলে সবসময় আপনার স্ত্রী বা স্বামীকে স্রষ্টার আশীর্বাদ হিসেবে মনে করুন। তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকুন। সন্তান ও পরিবারের প্রতি আপনার

দায়িত্ব ধর্ম নির্দেশিত পথে পালন করুন। জীবনের যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন সৎ থাকুন, স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাসে অটল থাকুন। তাহলে স্রষ্টা অবশ্যই আপনার ভাল কাজের জন্য আপনাকে পুরস্কৃত করবেন।

৬০. সর্বশেষে, সবরকম অবস্থাতেই প্রো-অ্যাকটিভ থাকুন। আপনার স্ত্রী বা স্বামীর সাথে আলোচনাকালে শান্ত থাকুন, রেগে যাবেন না। যদি দেখেন তিনি রেগে যাচ্ছেন তাহলে তখনকার মত আলোচনা মূলতবি রাখুন। পরে যখন শান্ত হবেন তখন আবার সুযোগ বুঝে আলোচনা করতে পারবেন। মনে রাখবেন ক্রোধ-রোষ দ্বারা নিজের আচরণকে প্রভাবিত করা যাবে না। ক্রোধ-রোষ দ্বারা পরিচালিত হওয়া মানেই হচ্ছে রি-অ্যাকটিভ বা প্রতিক্রিয়াশীল হওয়া। ক্রোধ-রোষ ও প্রতিক্রিয়া সবসময়ই মানুষের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ প্রসঙ্গে একজন মহামানব চমৎকার উপদেশ দিয়েছেন: 'রাগের মাথায় কখনও সিদ্ধান্ত নেবে না, কোন কাজ করবে না, কোন আদেশ দেবে না, কাউকে শাস্তি দেবে না।' শুধু ব্যক্তিজীবন নয়—জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই বাণীকে অনুসরণ করুন। প্রো-অ্যাকটিভ থাকুন, প্রশান্ত থাকুন, ঠাণ্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিন। আপনার জীবন সুন্দর হয়ে উঠবে, সফল হবে।

সুখী পরিবার নির্মাণে করণীয়

যেকোন ব্যক্তির আত্মনির্মাণের জন্যে সুখী ও অনুকূল পারিবারিক পটভূমি সবচেয়ে বেশি সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করতে পারে। অনুকূল পারিবারিক পরিমণ্ডল ব্যক্তিত্ব ও মেধা বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। পরিবার গড়ে ওঠে একজন নারী ও একজন পুরুষের পারিবারিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে। এই সম্পর্ক যত ঘনিষ্ঠ হবে, যত মমতা ও শ্রদ্ধামাখা হবে, পারিবারিক আচার আচরণ যত প্রো-অ্যাকটিভ, সুশৃঙ্খল ও সুপরিকল্পিত হবে, ততই পারিবারিক পরিমণ্ডল মেধা ও সৃজনশীলতা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি সুখী পরিবার ও অনুকূল পারিবারিক পরিমণ্ডলের ভিত্তি হচ্ছে ভালবাসা ও মমতা, শ্রদ্ধা, শৃঙ্খলা ও আত্মিক একাত্মতা। অনুকূল পারিবারিক পরিমণ্ডলে নারী ও পুরুষের সম্পর্ক পরস্পরের পরিপূরক। পারিবারিক পরিমণ্ডলে এই পরিপূরক একাত্মতাই ব্যক্তির আত্মনির্মাণ ও মেধার বিকাশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

পারিবারিক জীবনে পরিপূরক একাত্মতা সৃষ্টির জন্যে পারস্পরিক ভালবাসা, মমতা বৃদ্ধির এবং সুশৃঙ্খলতা সৃষ্টির জন্যে নারী পুরুষ নির্বিশেষে কিছু নিয়ম ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করা যেতে পারে। এই নিয়ম ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করলে পারিবারিক জীবন সুশৃঙ্খল ও মমতাপূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের ব্যক্তিত্ব ও মেধার বিকাশ সহজ হবে। সফল ও সুখী পরিবার গঠনের জন্যে পুরুষ ও নারী উভয়ের করণীয় হচ্ছে:

ব্যক্তি জীবনে

১। স্রষ্টার ওপর বিশ্বাস ও আস্থা রাখা।
২। নিয়মিত ইবাদত/উপাসনা করা।
৩। নিয়মিত মেডিটেশন ও ১৫ মিনিট ব্যায়াম করা।
৪। দায়িত্বশীল ও আত্মবিশ্বাসী হওয়া।
৫। আত্মউন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়মিত পড়াশোনা করা।
৬। সব সময় আশাবাদী হওয়া ও শোকর গুজার করা।
৭। সব ব্যাপারে সময় ও নিয়মানুবর্তী হওয়া।
৮। আগে থেকে পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করা।
৯। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি থাকা।
১০। শালীন ও মার্জিত পোশাক পরিধান করা।
১১। পরচর্চা ও গীবত বর্জন করা।
১২। মিথ্যা বর্জনে সচেষ্ট থাকা।
১৩। নিয়মিত আত্মপর্যালোচনা করা।

আচরণে

১। সব সময় প্রো-অ্যাকটিভ থাকা।
২। সব সময় হাসিমুখে কথা বলা।
৩। কথা ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা।
৪। নিজেকে আদর্শ মানুষ হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করা।
৫। রাগ ও ক্রোধের বশে কোন কাজ না করা।

৬। বিতর্ক ও ঝগড়া কৌশলে পরিহার করা।
৭। সেন্টিমেন্ট ও আবেগ প্রকাশে কুশলী হওয়া।
৮। কর্মচারী ও গৃহকর্মীর সাথে মানবিক আচরণ করা।
৯। কাউকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি না দেয়া।
১০। কাউকে ঠকানোর চেষ্টা না করা।
১১। কারও প্রতি ঈর্ষা পোষণ না করা।
১২। স্বজ্ঞানে অন্যের ক্ষতি সাধন না করা।

পারিবারিক জীবনে

১। পরস্পরকে বুঝতে চেষ্টা করা।
২। অন্যের কথায় কান না দেয়া। ভুল বোঝাবুঝি নিজেরাই আলাপ আলোচনা করে দূর করা। তৃতীয় কাউকে এতে না জড়ানো।
৩। ঘরের কথা বাইরে না বলা।
৪। পরস্পরের জন্যে নিয়মিত দোয়া করা।
৫। পরিবারে অশান্তি ও কলহ সৃষ্টি হতে পারে এমন কথা না বলা।
৬। একান্নবর্তী পরিবার হলে সবার সন্তানকেই এক নজরে দেখা। সবার জন্যে একই মানের কেনাকাটা করা।
৭। ভ্রমণ, বিনোদনের ব্যাপারে পরিবারের বেশির ভাগের মত অনুসারে সিদ্ধান্ত নেয়া। সবাইকে নিয়ে বেড়ানো।
৮। পরিবারের সবাইকে নিয়ে নিয়মিত আত্মউন্নয়নমূলক আলোচনার আয়োজন করা।
৯। অপ্রয়োজনে জ্বলে থাকা বাতি বা ফ্যান নিভিয়ে রাখা।
১০। পরিমিত পানি খরচ। অহেতুক কল খোলা রেখে পানি অপচয় না করা।
১১। সমাজের চোখে দৃষ্টিকটু সম্পর্ক বর্জন। দাম্পত্য জীবনে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করে এমন সম্পর্ক বর্জন করা।
১২। গৃহকর্মীদেরকে নিজেদের সম্মানের খাবার প্রদান করা।
১৩। পারিবারিক পরিবেশকে ধূমপান ও নেশামুক্ত এলাকায় পরিণত করা।

সন্তান পালনে

১। ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে সকল সন্তানকে সমান দৃষ্টিতে দেখা।
২। সন্তানকে নেতিবাচক কথা বলে তিরস্কার না করা। সন্তানকে রাগের মাথায় অভিশাপ না দেয়া।
৩। সন্তানকে ছোট থেকেই স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা।
৪। সন্তানকে পর্যাপ্ত সময় দেয়া। সন্তান একটু বড় হওয়ার সাথে সাথে তাদের বন্ধু-বান্ধবদের ব্যাপারে সজাগ থাকা। সন্তানের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করা যাতে সন্তান মানসিকভাবে বাবা-মার সাথে একাত্মতা অনুভব করে। সন্তানের সামনে আদর্শ হিসেবে নিজেদের উপস্থাপন করা।
৫। সন্তানকে সব সময় আদেশ না করে তার করণীয় কাজ যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দেয়া।
৬। সন্তান কোন কিছু চাওয়ার সাথে সাথেই তাকে না দেয়া। সন্তানের অন্যায় আবদার পূরণ না করা।
৭। সন্তানের বয়স ১৮ বছর হলে পারিবারিক পরামর্শে তাকেও অংশীদার করা।
৮। সন্তান বিনোদনের নামে অপসংস্কৃতির শিকার হচ্ছে কিনা সে দিকে লক্ষ

রাখা।

৯। সন্তানকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগে দক্ষ মানুষ রূপে গড়ে উঠতে সাহায্য করা।

১০। সন্তানের নৈতিক, মানসিক, আত্মিক, সৃজনশীল গুণাবলী বিনাশের সুযোগ সৃষ্টি করা।

১১। চাকরির পরিবর্তে সন্তানকে স্বাধীন পেশা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।

১২। সন্তানকে আগে সালাম প্রদানে ও হাত মিলানোয় অভ্যস্ত করে তোলা।

১৩। সন্তানের সামনে পরিবারের যথাযথ আর্থিক ধারণা প্রদান করা। আর্থিক ব্যাপারে কোন মিথ্যা কথা না বলা।

পরিবারে স্বামী হিসেবে করণীয়

১। স্বামী হিসেবে নিজেকে পরিবারের প্রধান দায়িত্বশীল মনে করা।

২। পরিবারের দায়িত্ব পালনকে ইবাদত মনে করা।

৩। স্ত্রীকে বান্ধবী, জীবনসঙ্গিনী ও ঘরের প্রধান হিসেবে বিবেচনা করা।

৪। পারিবারিক প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করা।

৫। স্ত্রীর ভাল কাজ, অবদান ও কৃতিত্বের প্রশংসা করা।

৬। স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকা এবং ভালবাসা ও অনুরাগ, কথা ও আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ করা।

৭। কর্মস্থলের বা বাইরের রাগ, ক্ষোভ ঘরের স্ত্রী-সন্তান বা গৃহকর্মীর উপর প্রকাশ না করা।

৮। নিজের ভুল নিঃসঙ্কোচে স্ত্রীর নিকট স্বীকার করা। অন্যায় করলে মাফ চেয়ে নেয়া।

৯। আয় অনুসারে স্ত্রীর প্রয়োজন পূরণ, ছোটখাট উপহার দান ও হাতখরচা প্রদান করা এবং হাতখরচা ব্যয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস না করা।

১০। স্ত্রীর অর্জিত অর্থ ও সম্পদ ব্যয়ে স্ত্রীকে স্বাধীনতা প্রদান।

১১। স্ত্রীর যুক্তি সঙ্গত আবদার পূরণ করা।

১২। নিজের আয় সম্পর্কে প্রথম থেকেই স্ত্রীকে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া ও অবৈধ পন্থায় অর্থোপার্জন না করা।

১৩। পেশাগত বা পারিবারিক সংকট দেখা দিলে স্ত্রীর সাথে তা খোলামেলা আলোচনা করা।

১৪। আত্মীয়-স্বজনকে উপহার বা সাহায্য করার ব্যাপারে স্ত্রীকে অযৌক্তিক বাধা না দেয়া।

১৫। স্ত্রীর আত্মীয়দের নিয়ে তাকে কথা না শোনানো।

১৬। স্ত্রীর মা-বাবাকে নিজের মা-বাবার মত শ্রদ্ধা করা।

১৭। ঘরের খুঁটিনাটি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা। ঘরের কাজে সাধ্যমত সাহায্য করা।

১৮। স্ত্রীর ভুল-ত্রুটি নিয়ে সন্তানদের সামনে ভর্ৎসনা না করা।

১৯। সপ্তাহে একদিন পুরোপুরি স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে কাটানো। ঘরের প্রতিটি কাজ এমনকি রান্নাবান্নায়ও পিকনিকের মত অংশ নেয়া।

২০। স্ত্রীর যে কোন ভুল-ত্রুটিকে সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করা এবং রূঢ় ভাষায় সমালোচনা না করে সহানুভূতির সাথে তার ভুল ধরিয়ে দেয়া।

২১। বাইরে কাজ আছে বলে ক্লাব বা বন্ধু-বান্ধবদের সাথে তাস খেলে বা ফালতু আড্ডায় সময় নষ্ট না করে পরিবারের আত্মিক ও মানসিক উন্নতির জন্যে সময় ব্যয় করা।

২২। অন্যের কাছে স্ত্রীর বদনাম না করা।

২৩। পেশাগত দক্ষতা অর্জনে সদা সচেষ্ট থাকা।

২৪। অর্থ অপচয় না করা। আবেগ প্রসূত কেনাকাটা না করা।

২৫। নিজের দোষ খুঁজে বের করার চেষ্টা করা।

২৬। স্ত্রীর শারীরিক খোঁজখবর নিয়মিত জিজ্ঞেস করা। অসুস্থ হলে নিজে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া।

২৭। স্ত্রীর যে কোন অভিযোগ মনোযোগ দিয়ে শোনা। কোন প্রস্তাব বা কথায় প্রথমেই না বলা থেকে বিরত থাকা।

পরিবারে স্ত্রী হিসেবে করণীয়

১। নিজেকে পরিবারের প্রাণ মনে করা।

২। সংসারের প্রতিটি কাজকে ইবাদত মনে করা।

৩। স্বামীকে বন্ধু, জীবনসঙ্গী, দিশারী ও পারিবারিক প্রধান হিসেবে বিবেচনা করা।

৪। স্বামীকে লুকিয়ে কোন কাজ না করা।

৫। স্বামীর ভাল কাজ, অবদান ও কৃতিত্বের জন্যে গর্ববোধ করা।

৬। স্বামীর প্রতি সর্বাবস্থায় বিশ্বস্ত থাকা এবং ভালবাসা ও অনুরাগ কথা ও আচরণে প্রকাশ করা।

৭। স্বামী-সন্তান বাইরে থেকে আসার সাথে সাথে কোন সমস্যা বা অভিযোগ না করা।

৮। কোন ভুল বা অন্যায় হয়ে গেলে নিঃসঙ্কোচে তা স্বীকার করা বা স্বামীর কাছে মাফ চেয়ে নেয়া।

৯। নিজের হাতখরচা থেকে কখনও কখনও স্বামীর জন্যে ছোটখাট উপহার কেনা।

১০। প্রয়োজনে নিজের অর্জিত অর্থ স্বামী ও সংসারের জন্যে খরচ করা।

১১। স্বামীর কাছে কোন অযৌক্তিক আবদার না করা।

১২। স্বামীর যুক্তিসঙ্গত আয় সম্পর্কে ধারণা রাখা। আয়ের মধ্যেই সংসারের খরচ সীমিত রাখা। অতিরিক্ত খরচ ও চাপ সৃষ্টি করে স্বামীকে দূর্নীতিপরায়ণ হতে বাধ্য না করা।

১৩। যে কোন বিপদে বা সংকটে স্বামীর পাশে অটল পাহাড়ের ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকা।

১৪। স্বামীর অগোচরে কাউকে কিছু না দেয়া।

১৫। স্বামীর আত্মীয়-স্বজন নিয়ে খোঁটা না দেয়া।

১৬। শ্বশুর-শাশুড়ীকে নিজের বাবা-মায়ের মত শ্রদ্ধা করা।

১৭। ঘরের খুঁটিনাটি সমস্যা নিজেই সমাধানে সচেষ্ট থাকা।

১৮। সন্তানের সামনে স্বামীর সাথে ঝগড়া না করা এবং তার ভুল-ত্রুটি নিয়ে সমালোচনা না করা।

১৯। চাকরিজীবী হলেও সন্তান ও সংসারের ব্যাপারে যাতে কোন অবহেলা না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা।

২০। স্বামীর যে কোন অক্ষমতাকে সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করা।

২১। আত্মউন্নয়ন ও আত্মিক উন্নয়নের কাজে স্বামীকে সহযোগিতা করা।

২২। অন্যের কাছে স্বামীকে ছোট না করা।

২৩। মা হিসেবে সন্তানের মাঝে মহৎ মানুষের গুণাবলীকে বিকশিত করার চেষ্টা করা।

২৪। গ্যাসের চুলা প্রয়োজনের বাইরে সব সময় বন্ধ রাখা।

২৫। সকল ধরনের অপচয়ের বিরুদ্ধে পরিবারের সবার মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

২৬। অভিমান না করা। নিজের কষ্টকে বড় করে না দেখা।

২৭। ঘর-বাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি রাখা।

পরিবারের সবাই নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করলে সুখী পারিবারিক পরিমণ্ডল খুব সহজেই গড়ে উঠতে পারে।

কোয়ান্টাম জীবন কণিকা

০

দৃষ্টিভঙ্গি বদলান জীবন বদলে যাবে।

১

প্রো-অ্যাকটিভ হোন। প্রো-অ্যাকটিভ মানুষের প্রতি অন্যরা আকৃষ্ট হয়। রি-অ্যাকটিভ ব্যক্তি সবসময়ই মানুষের বিতৃষ্ণার কারণ হয়।

২

ভাল বক্তার চেয়ে ভাল শ্রোতা অন্যকে সহজে প্রভাবিত করে।

৩

একজন মানুষকে তার নাম ধরে সম্বোধন করুন। আলাপ-আলোচনায় একাধিকবার তার নাম উল্লেখ করুন।

৪

অন্যদের ব্যাপারে আন্তরিকভাবে আগ্রহী হোন। তাদের নিজের কথা বলার সুযোগ দিন।

৫

সবাইকে আগে নিজে সালাম দিন।

৬

অন্যের কাছ থেকে যে ব্যবহার প্রত্যাশা করেন, আগে নিজে সেই আচরণ করুন।

৭

দিনে কমপক্ষে ২০ বার বলুন, 'আমি ভাল আছি।'

৮

হেসে কথা বলুন। এতে আপনি শুধু নিজেই আনন্দিত হবেন না, অন্যরাও খুশি হবে।

৯

নতুন বন্ধুত্ব করুন, কিন্তু পুরানো বন্ধুত্বকে গুরুত্ব দিন।

১০

গোপনীয়তা রক্ষা করুন।

১১

নিজের ভুল স্বীকার করার মত সাহসী হোন।

১২

সাহসী হোন। মনে মনে ভয় থাকলেও সাহসের ভান করুন। কেউই ভান ও সত্যিকার সাহসের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না।

১৩

কান পেতে থাকুন। সুযোগ অনেক সময়ই দরজায় খুব আস্তে করে টোকা দেয়।

১৪

কারও আশাকে নষ্ট করবেন না, হয়তো এই আশাই তার শেষ সম্বল।

১৫

রাগান্বিত অবস্থায় কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না।

১৬

কারও রুমে ঢোকার সময় আত্মপ্রত্যয়ের সাথে ঢুকুন।

১৭

কাজ শেষ না হতে পারিশ্রমিক শোধ করবেন না।

১৮
কুৎসা ও কান কথা থেকে দূরে থাকুন।
১৯
যার হারানোর কিছু নেই, তার ব্যাপারে সতর্ক থাকুন।
২০
যা করতে পারবেন না বা করবেন না, সে ব্যাপারে বিনয়ের সাথে প্রথমেই 'না' বলুন।
২১
'সমস্যা' শব্দটির পরিবর্তে 'সম্ভাবনা' শব্দটি বেশি ব্যবহার করুন।
২২
যে কোন সঙ্কটকে বিপদ না ভেবে নতুন চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিন।
২৩
সাহসী ও ঝুঁকি গ্রহণে উৎসাহী হোন। সুযোগ হাতছাড়া করবেন না। পেছনের দিকে তাকালে দেখবেন, কাজ করে অনুতপ্ত হওয়ার চেয়ে যে সুযোগ আপনি হাতছাড়া করেছেন, তা নিয়েই অনুতপ্ত হচ্ছেন বেশি।
২৪
কোন গুরুতর শারীরিক সমস্যা দেখা দিলে কমপক্ষে ৩ জন বিশেষজ্ঞের মহামত গ্রহণ করুন।
২৫
পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত বৈপ্লবিক ও নতুন নতুন ধারণা এসেছে, তা প্রথমে কোন একজনের মস্তিষ্কে নীরব মুহূর্তে এসেছে। কমিটি-কমিশন কোন নতুন ধারণার জন্ম দিতে পারেনি।
২৬
নিজের অফিস, ঘর ও পারিপার্শ্বিকতাকে পরিচ্ছন্ন রাখার জন্যে জেহাদ ঘোষণা করুন।
২৭
দীর্ঘসূত্রিতা ও আলস্যকে প্রশ্রয় দেবেন না। যখন যা করা প্রয়োজন, তখনই তা করুন।
২৮
'আমি এ বিষয়ে জানি না' এ কথাটি বলতে কখনও ভয় পাবেন না।
২৯
'আমি দুঃখিত' কথাটি সব সময় আন্তরিকতার সাথে উচ্চারণ করুন।
৩০
১৯টি এমন বিষয়ের তালিকা তৈরি করুন, যা আপনি মৃত্যুর আগে উপভোগ বা অর্জন করতে চান। তালিকাটি সব সময় নিজের মানিব্যাগ বা ভ্যানিটি ব্যাগে রাখুন।
৩১
নিয়ত স্বতঃস্ফূর্তভাবেই পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে যায়।
৩২
প্রতিটি জিনিসকে পুরোপুরি গ্রহণ করুন। তাহলেই আপনি এ থেকে পরিপূর্ণ শিক্ষা নিতে পারবেন।
৩৩
দেহ হচ্ছে আমাদের অন্তর্গত সত্তার বহিরাবরণ। বহিরাবরণের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কিন্তু অন্তর্গত সত্তার কোন সীমাবদ্ধতা নেই।

৩৪

রোগের দেহগত কারণের সাথে সাথে এর মনোগত কারণ খুঁজে বের করুন। মনোগত কারণ বুঝতে পারলে দেহগত কারণ দূর হতে সময় লাগবে না।

৩৫

রোগ ব্যাধির অনুপস্থিতিই সুস্বাস্থ্য নয়। সুস্বাস্থ্য হচ্ছে ভাল থাকার এক অন্তর্গত অনুভূতি, যা আপনাকে আনন্দোচ্ছল করে রাখে।

৩৬

প্রতিটি মানুষের তার সহজাত নিরাময় ক্ষমতাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে না পারার কারণ হচ্ছে এই ক্ষমতা প্রয়োগে সচেতন সামর্থ্য বা বিশ্বাসের অভাব।

৩৭

সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হলে জীবন সম্পর্কে গভীর ধারণাপ্রসূত নতুন জ্ঞান ও উপলব্ধি প্রয়োজন।

৩৮

গুরুতর বা জীবনের প্রতি হুমকি স্বরূপ রোগের ক্ষেত্রে নিরাময় লুকিয়ে থাকে একাধিক জটিলতা বা ভারসাম্যহীনতার স্তরের অভ্যন্তরে।

৩৯

আত্মার কোন মাত্রা নেই। আত্মা হচ্ছে বিশুদ্ধ শক্তি। পাত্রের মনোগত দৃষ্টিভঙ্গির ওপরই এর প্রকাশিত রূপ নির্ভর করে।

৪০

আমরা উপলব্ধি করতে পারি। এর অর্থ হচ্ছে, আমাদের নিকট প্রেরিত প্রতিটি সঙ্কেতকে আমরা অর্থবহ করে তুলি।

৪১

মহাবিশ্বের প্রাথমিক তথ্যাবলীকে বাস্তবতায় রূপান্তরিত করার প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে উপলব্ধি।

৪২

পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যা উপলব্ধি করি, তা মহাবিশ্বের অসীম শক্তিসরোবর থেকে স্পন্দিত স্পন্দন বা তরঙ্গেরই বাছাইকৃত রূপ।

৪৩

আপনি যে বিশ্বে বাস করেন, তা আসলে আপনার অন্তরেই বসবাস করে।

৪৪

একটি সম্ভাবনার ছবি কি কেউ কখনও তুলতে পেরেছে? কোয়ান্টাম জগৎ সেরকমই। আপনি যখন একটি কথা বলেন বা একটি চিন্তা করেন তখন আপনি একটি কাজ করেন। সমুদ্র থেকে একটি তরঙ্গ এসে সৈকতে আছাড় খায়। স্থান-কালে সীমিত বিশ্বে তা একটি ঘটনার রূপ নেয়। কিন্তু পুরো সাগরই পশ্চাতে পড়ে থাকে। এ সাগর হচ্ছে সম্ভাবনার বিশাল নীরব সরোবর, যেখানে অসংখ্য তরঙ্গ ভূমিষ্ঠ হওয়ার জন্যে অপেক্ষমাণ।

৪৫

প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় গ্রহ নক্ষত্র সৃষ্টি হয়। আর আমরা আমাদের নিজেদের বিকশিত করি।

৪৬

আপনার শরীরকে আপনি এখন যে রূপে দেখছেন, তা হচ্ছে আপনার অন্তর্গত চিন্তারই ত্রিমাত্রিক দৈহিক ছবি।

৪৭

আত্মিক সম্পর্ক সব সময়ই প্রেরণার উৎসে রূপান্তরিত হয়।

৪৮
আমরা সবাই কিছু দৃশ্য বা মনছবি কল্পনা করি। আমাদের সৃষ্ট কল্পনা বা মনছবিতেই আমাদের প্রতিটি কোষ ক্রমান্বয়ে আস্থা স্থাপন করে।

৪৯
বদ অভ্যাস মনমানসের এক জরাজীর্ণ অবস্থান, যা এক সময় নতুন ধারণার মাধ্যমে মুক্তির পথ দেখাতে চেয়েছিল, কিন্তু বর্তমানে তা গন্তব্যহীনতায় পৌঁছে গেছে।

৫০
সচেতনতার পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই সকল পরিবর্তনের সূচনা ঘটে।

৫১
প্রতিদিন অন্তত কয়েক মিনিটের জন্যেও যদি রোগের মুখোশ ভেদ করে আপনি আপনার অন্তর্গত সত্তার সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারেন, তাহলেই দেখবেন নিরাময় প্রক্রিয়া ব্যাপক গতিলাভ করেছে।

৫২
দিনের প্রতিটি ঘণ্টায় অন্তরে প্রশান্তি অনুভব সংজ্ঞাপ্রাপ্ত আলোকিত সত্তার লক্ষণ। এমন হলে কথাই নেই। তা না হয়ে অন্তরে প্রশান্তি লাভ যদি কদাচিৎও ঘটে, তাও তা আপনাকে নিয়ে যাবে বহু দূর। ক্রমান্বয়ে জাগ্রত হবে আপনার অন্তর্গত সত্তা।

৫৩
যে প্রেম সব কিছুকেই গ্রহণ করে, তার সন্ধান শুধু আপনার হৃদয়েই পেতে পারেন।

৫৪
জৈব ছন্দের মাধ্যমে দেহ তার ভারসাম্য বজায় রাখে। আর এই জৈব ছন্দ প্রকৃতির গভীরে প্রবহমান ছন্দের সাথে সম্পৃক্ত।

৫৫
মানুষ শুধু দেহ নয়। মানুষ শুধু মনও নয়। মানুষ হচ্ছে এমন এক সত্তা যার রয়েছে দেহ ও মন।

৫৬
আপনার দেহ ও মন অন্তর্গত চেতনারই বিকশিত ভিন্ন ভিন্ন রূপ।

৫৭
আপনার অন্তর্গত চেতনাই প্রকৃতির সর্বোচ্চ মেধা। মহাবিশ্বের সকল জ্ঞানের প্রতিফলন সেখানেই ঘটে। এই মেধা আপনার জীবনের নীল নকশার সাথে অবিচ্ছেদ্য, যা কেউ কখনও মুছে ফেলতে পারে না।

৫৮
আপনার দেহের প্রতিটি কোষ হচ্ছে মহাজাগতিক কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত মিনি টারমিনাল।

৫৯
অন্তর্গত চেতনা নিজেকে চিন্তা রূপে বা দেহকোষের অনুরূপেও নিজেকে প্রকাশ করতে পারে।

৬০
সচেতনতার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ব্যর্থ হলেই আমরা কোন না কোন খাদে পতিত হই। আমাদের দৈহিক অস্তিত্বের বিরাট এলাকা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। আর পরিণামে আমরা রোগগ্রস্ত হই, বার্ধক্য আসে, মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ি।

৬১
ভয় ও আতঙ্ক দূর হয়ে কোয়ান্টাম স্পন্দন পরিবর্তিত হওয়ার মধ্য দিয়েই সুস্থতার সূচনা হয়।

৬২
দেহ ও মনে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারি—এই বিশ্বাসই পরিপূর্ণ সুস্থতার জন্যে প্রথম প্রয়োজন।

৬৩
যে কোন ব্যথা বা রোগ হচ্ছে একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। যে কোন একটি রোগের তুলনায় আমাদের সুসাস্থ্যের ক্ষমতা হচ্ছে সমুদ্রতুল্য।

৬৪
প্রেম, মমতা বা আত্মিক চেতনা বর্জিত জীবন সৃষ্টি করে এক গুরুতর ভারসাম্যহীন পরিস্থিতি। এ ভারসাম্যহীনতা শোধরানোর জন্যে প্রতিটি দেহকোষ আর্তচিৎকার করতে থাকে। শরীরের বিভিন্ন জটিল রোগ এই আর্তচিৎকারেরই বাহ্যিক প্রকাশ।

৬৫
নতুন পুনরুজ্জীবিত দেহ পেতে হলে আপনাকে নতুন ধারণায় উজ্জীবিত হতে ইচ্ছুক হতে হবে। নতুন উপলব্ধিই নতুন সমাধান দিতে পারে।

৬৬
পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র সৃষ্টি যে চিন্তা ও অনুভূতি দ্বারা তার জৈবিক অবস্থা বদলাতে পারে।

৬৭
বাস্তবতা আমাদের অন্তর্গত ধারণারই প্রতিফলন। অন্তর্গত ধারণা বদলে গেলে বাস্তবতাও বদলে যায়।

৬৮
নিজের প্রতি গভীরভাবে তাকান। আপনি দেখবেন, আপনার শরীরকে ক্রমাগত সেই পুরানো সঙ্কেতই পাঠাচ্ছেন। সেই পুরানো আশঙ্কা, সেই পুরানো প্রত্যাশারই পুনরাবৃত্তি করছেন। তাই আপনার শরীরও সেই পুরানো শৃঙ্খলেই শৃঙ্খলিত রয়ে গেছে।

৬৯
সাধারণ জাগ্রত অবস্থায় নিজের সম্পর্কে আমাদের ধারণা অপরিপূর্ণতা দোষে দুষ্ট। তাই আমরা বুঝতেই পারি না আমাদের নিজের ভেতরেই শান্তি ও আনন্দের কত বড় সরোবর রয়েছে। শুধু ধ্যানের স্তরেই নিজের অন্তর্গত প্রশান্তি ও আনন্দের সরোবর আবিষ্কৃত হতে পারে।

৭০
দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা দিয়ে কেউ আজ পর্যন্ত নতুন পৃথিবী আবিষ্কার করতে পারেনি। প্রত্যয় ও সাহসই নতুন পৃথিবী আবিষ্কারের চালিকাশক্তি।

৭১
অতীতের 'আমি'ই আমার বর্তমানকে সৃষ্টি করেছে। অতীতের ভুল 'প্রোগ্রামিং'-এর ফসলই আমার বর্তমান।

৭২
দুশ্চিন্তা করে সচেতনভাবে রোগ সৃষ্টি না করে সচেতন সুচিন্তার মাধ্যমে আমরা সুস্বাস্থ্য সৃষ্টি করতে পারি।

৭৩
যখনই আপনি অনুভব করবেন যে, আপনার শরীরের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, তখনই আপনি সুস্বাস্থ্যের সুপ্রভাতে উপনীত হবেন।

৭৪
বাস্তবতা নির্মাণের অসীম শক্তি আমাদের সবারই রয়েছে। সীমাহীন সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আমরা এই অসীমতাকে সীমিত করে ফেলি।

৭৫
ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ মহাবিশ্বের সকল ঘটনাপ্রবাহ এক চমৎকার ছন্দ ও নিয়মে বাঁধা; এক সুগভীর চেতনা সবকিছুর মধ্যেই ক্রমপ্রবহমান।

৭৬
আপনি নিজের ভেতরে এক জ্ঞানী সত্তার অস্তিত্ব মেনে নিলে আপনার দৈহিক সবকিছুর প্রকাশ আপনার নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। আপনি নিজেই তখন নিজের সবকিছু পরিস্ফুটনের আধারে পরিণত হন।

৭৭
আমাদের অস্তিত্বের প্রতিটি মুহূর্তে আমরা নতুন দেহ সৃষ্টি করছি। এক বছর আগে আপনার শরীরে যে বস্তু ছিল, তার শতকরা ৯৮ ভাগ পরমাণু ইতিমধ্যে বদলে গেছে। অর্থাৎ আমরা এমন একটি ভবনে বাস করছি যার ইটগুলোকে প্রতিনিয়ত ধারাবাহিকভাবে বদলানো হচ্ছে।

৭৮
অন্তর্গত চেতনার সাথে সংযোগের মাধ্যমেই আপনি আপনার যথার্থ প্রয়োজন উপলব্ধি করতে পারবেন। নিজের প্রতি যথার্থ মনোযোগই আপনাকে অনন্য করে তোলে। নিজের প্রতি যথার্থ মনোযোগ দেয়ার উপায় হচ্ছে ধ্যান।

৭৯
আপনার অস্তিত্বের কেন্দ্রে বিরাজমান তথ্যতরঙ্গ প্রতি মুহূর্তেই আপনার দেহকে নতুন ভাবে নির্মাণ করছে। আপনার সামগ্রিক অস্তিত্ব হচ্ছে এই তথ্যতরঙ্গের সামষ্টিক প্রকাশিত রূপ। এই তথ্যতরঙ্গের প্যাটার্ন পরিবর্তিত করে আপনি আপনার নিজেকে বদলাতে পারেন।

৮০
চিন্তা করার অর্থ হচ্ছে নিজের ভেতরে একটি প্যাটার্ন সৃষ্টি করা, যা বাস্তবতার মতই জটিল দুর্বোধ্য ও সমৃদ্ধ। চিন্তাই আমাদের নিজস্ব বিশ্বধারণা সৃষ্টি করে।

৮১
মানব দেহ জমাটবাঁধা স্থবির স্থাপত্য নয়। দেহ হচ্ছে কোটি কোটি বছরের তথ্যে সমৃদ্ধ নিয়ত প্রবহমান তথ্যভাণ্ডারের শারীরিক রূপ।

৮২
মানবদেহ প্রথম অস্তিত্ব লাভ করে অদৃশ্য স্পন্দনে, যাকে বলা হয় কোয়ান্টা স্পন্দন। এরপর তা শক্তি ও দেহাণুতে রূপান্তরিত হয়।

৮৩
কোয়ান্টা স্পন্দনকে কণা বা শক্তির মূল একক হিসেবে সংজ্ঞাবদ্ধ করা হয়েছে, যা সবচেয়ে ক্ষুদ্র পরমাণুর চেয়েও এক কোটি থেকে দশ কোটি গুণ ক্ষুদ্র। এই স্তরে বস্তু ও শক্তি পরস্পর রূপান্তরশীল। সত্যিকারের নিরাময় এখান থেকেই শুরু হয়।

৮৪
প্রচলিত চিকিৎসাব্যবস্থা যে দেহের চিকিৎসা করতে চায়, বাস্তবে আমাদের দেহ সে দেহ থেকে ভিন্ন। আমাদের দেহ 'চিন্তা' করতে পারে। কারণ ওখানে কী হচ্ছে তা সে জানে। এ জানা শুধু মস্তিষ্কের মাধ্যমেই নয়। বরং শরীরের সর্বত্র প্রতিটি কোষের মধ্যে সংবাদবাহক অণুর 'রিসিপ্টর' রয়েছে।

৮৫
শরীরের প্রতিটি কোষ, টিস্যু ও অঙ্গ আপনার মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে চিৎকার করতে পারে। যখনই আপনি সেখানে মনোযোগ দেন, তখনই নিরাময় প্রক্রিয়ার সূচনা হয়।

৮৬
দেহ হচ্ছে সেরা ওষুধ কারখানা। যখন যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু ওষুধই সে তৈরি করে। আর এ ওষুধ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকে পুরোপুরি মুক্ত।

৮৭
সাধারণ জাগ্রত অবস্থাকে অতিক্রম করে চেতনার উচ্চ স্তরে নিজেকে উত্তীর্ণ করার সাথে সাথে দেহ আপনার নির্ভরযোগ্য বাহনে পরিণত হয়। তখন দেহ আপনার আত্মার ছন্দের সাথে পুরোপুরি ছন্দায়িত হয়।

৮৮
আমরা আমাদের মনকে মস্তিষ্কে বন্দী রাখতে পারি না। দেহের প্রতিটি কোষের মধ্যেই মনের অস্তিত্ব রয়েছে আর দেহের বাইরেও তা বিশ্বমনের সাথে সংযুক্ত।

৮৯
আপনার মন আপনাকে দিচ্ছে নিয়ন্ত্রণ, আপনার ইচ্ছেমত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার সামর্থ্য।

৯০
অন্তরতম সত্তার সাথে সংযোগ হলেই বিশ্বাস সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হয়।

৯১
সচেতনভাবে যখন আপনি আত্মিক সত্তার সন্ধান করেন, তখন জীবনে যুক্ত হয় নতুন মাত্রা। নিজেকে তখন আপনি দেখতে পাবেন অস্তিত্বের এক সীমাহীন দিগন্তে। নতুন নতুন অভিজ্ঞতা আস্বাদন করবেন। নতুন নতুন ভাষায় আপনার সংযোগ ও কথোপকথন হবে শরীরের ৭০ ট্রিলিয়ন কোষের সাথে।

৯২
প্রশান্ত মনই হচ্ছে শক্তির আসল ফল্গুধারা। মন প্রশান্ত হলে অন্তরের শক্তি জাগ্রত হয় এবং আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভবকে সম্ভব করে।

৯৩
আপনার সচেতনতার সাথে সংযোগ স্থাপন করার জন্যে প্রয়োজন নীরব মুহূর্ত। প্রতিদিন হাজারো কাজের ফাঁকে এই নীরব মুহূর্ত বের করে নিন।

৯৪
আপনার মধ্যেই রয়েছে অফুরন্ত শক্তির নিবাস—যেখানে আপনি যে কোন সময় নিজের ইচ্ছেমত প্রত্যাবর্তন করতে পারেন, আবির্ভূত হতে পারেন নিজের পূর্ণাঙ্গ রূপে। মেডিটেশনের মাধ্যমেই সম্পন্ন হতে পারে আপনার এই প্রত্যাবর্তন।

৯৫
নিরাময়ের জন্যে আপনার প্রথম প্রয়োজন এক প্রশান্ত মন।

৯৬
সচেতনতার নতুন মাত্রার সাথে সংযোগই নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করে।

৯৭
দেহের জৈবরসায়ন সচেতনতারই সৃষ্টি। বিশ্বাস, চিন্তা ও আবেগ সৃষ্ট রাসায়নিক বিক্রিয়াই প্রতিটি কোষের জীবনকে পরিচালনা করে।

৯৮
আপনার আজকের শরীরের দিকে তাকালেই আপনি আপনার গতকালের চিন্তাকে দেখতে পাবেন। আগামীকাল আপনার দেহ কেমন হবে তা দেখতে চাইলে আপনার আজকের চিন্তার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

৯৯
জীবন মানেই হচ্ছে অদৃশ্য স্পন্দনের দৃশ্যমান বিকাশ। এই অদৃশ্য স্পন্দনের

উৎসের যত কাছাকাছি যেতে পারবেন, আপনার নিজেকে, অন্যকে নিরাময় করার ক্ষমতা তত বাড়বে। এ জন্যে প্রয়োজন অনুভূতির গভীর থেকে গভীরে প্রবেশ, যেখানে রূপান্তরের জন্যে চেষ্টা করতে হয় না, সব কিছু ঘটে স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

১০০

মনের মাঝে যখন আমরা বিশুদ্ধ নীরবতা অনুভব করি, তখন দেহও নীরব নিস্তরঙ্গ হয়ে যায়। আর এই নীরবতার স্তর থেকে উৎসারিত নিরাময় প্রক্রিয়া অনেক বেশি শক্তিশালী ও কার্যকর।

১০১

আপনি কোয়ান্টাম চেতনার আলোকে শরীরকে দেখতে পারেন নীরব তথ্যপ্রবাহ রূপে। অবিশ্রান্ত ধারায় এই তথ্য স্পন্দন আপনার দেহকে সৃষ্টি করছে, নিয়ন্ত্রণ করছে। এই স্তরের প্রাণের গুপ্ত রহস্য হচ্ছে আপনার দেহের যে কোন কিছুই বদলানো যেতে পারে শক্তিশালী অভিপ্রায় বা নিয়ত ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে।

১০২

নিয়ত হচ্ছে মনের লাগাম। যা মনকে নিয়ন্ত্রণ করে, দেহকে সঠিক পথে পরিচালিত করে, যা দেহমনের নতুন বাস্তবতা জন্ম দেয়।

১০৩

আমরা যখন নিয়ত ঠিক করি, তখন আমাদের সুস্বাস্থ্য সৃষ্টি হয়। অশান্ত মন কর্তৃক সৃষ্ট বিশৃঙ্খল পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে উন্নীত হয় উচ্চতর বাস্তবতায়। আমরা প্রবেশ করি হৃদয়ের সাম্রাজ্যে।

১০৪

জীবনের মূল উৎস থেকেই উৎসারিত হয়েছে হৃদয়। তাই নিরাময় প্রক্রিয়ায় হৃদয়ের ভূমিকা অত্যন্ত শক্তিশালী। হৃদয়ের স্পর্শ ছাড়া কোন নিরাময়ই পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না। মমতা ও প্রেম দেহকে সুস্থ হওয়ার জন্যে ক্রমাগত প্রেরণা যোগায়।

১০৫

মমতাই জীবনকে পরিপূর্ণ করে। সচেতনতা পরিপূর্ণ হলে সেখানে শুধু প্রেমই বিরাজ করে। জীবনের মূল উৎস থেকে সচেতনতার প্রতিটি স্পন্দনই যাত্রা শুরু করে শুধুমাত্র মমতা হিসেবে।

১০৬

মমতার পরশ সবচেয়ে বড় উজ্জীবনী শক্তি। বর্ষার প্রমত্তা নদী দুই কূল উপচে বদ্ধ জলাশয়ের দূষিত পানিকে যেমন ঠেলে বের করে দেয়, তেমনি মমতা রোগকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

১০৭

নেতিবাচক মানসিক প্রভাবে ইমিউন সিসটেম দুর্বল হয়ে পড়লেই দেহ রোগাক্রান্ত হয়। তাই সুস্থতার জন্যে প্রথম প্রয়োজন এই নেতিবাচক মানসিক প্রভাব দূর করা।

১০৮

মমতা নিরাময় করে। অন্তর্গত সত্তার গভীর থেকে যখন মমতা উৎসারিত হয় তখন মমতাই সুস্বাস্থ্য সৃষ্টি করে।

১০৯

সকল ভয়ই মৃত্যুভয়ের প্রকাশ্য ছদ্মাবরণ। পরিবর্তনকে ভয় পাই বলেই আমরা ভয় দ্বারা আক্রান্ত হই।

১১০

নীরব মুহূর্তে প্রতিদিন অন্তত একবার করে বলুন, আমি সাহসী।

১১১

রোগ নিরাময় করতে হলে আপনাকে রোগের কোষগত স্মৃতিকে বদলাতে হবে।

আর তা সম্ভব আবেগ ও চিন্তার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে।

১১২

উচ্চতর অস্তিত্ব হচ্ছে অস্তিত্বের এমন একটি পর্যায় যেখানে সবকিছু স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে। শুধুমাত্র ইচ্ছাই রূপান্তরের প্রক্রিয়ার সূচনা ঘটায়।

১১৩

প্রত্যেকেরই 'আমি' সম্পর্কিত ধারণা গড়ে ওঠে অতীতের অভিজ্ঞতা ও চিত্রকল্পের ভিত্তিতে। ভয় আশা প্রত্যাশা স্বপ্ন মমতা হতাশা—এ সব কিছুকেই বলা হয় আমার। এর সবকিছু ঝেড়ে মুছে বাদ দেয়ার পরও 'আমার' কিছু বাকি থেকে যায়। এই বাকি অংশ হচ্ছে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, সব কিছুর নীরব সাক্ষী।

১১৪

'আমি' কে খুঁজে বের করার জন্যে কিছু করার প্রয়োজন নেই। কিছু করা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারলেই 'আমি' কে খুঁজে পাওয়া যাবে।

১১৫

আপনি আপনার অস্তিত্বের অনন্ত ও অপরিবর্তনীয় অংশটুকুর সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারলেই বুঝতে পারবেন আপনি অমর, অক্ষয়। আগুনের কাছে বরফ যেমন গলে যায়, তেমনি ভয়ও পালিয়ে যাবে আপনার জীবন থেকে।

১১৬

যে কোন রোগ থেকে নিরাময় লাভ করার পর এমন একটি সময় আসে যখন আপনার মধ্যে সুস্থতা ও ভাল থাকার অনুভূতি প্রবল হয়। আপনি হয়তো বলেন আমি এখন এক নতুন মানুষ। আসলেও আপনি তখন তা-ই।

১১৭

প্রকৃতির সাথে একাত্ম হোন। প্রকৃতি মন, দেহ ও আত্মার মাঝে সব সময় ভারসাম্য এনে দেয়।

১১৮

আমরা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্ব হলেও মহাবিশ্বের নিয়ন্ত্রণকারী চেতনার সাথে এক অদৃশ্য বন্ধনে আবদ্ধ।

১১৯

সাধারণ জাগ্রত বাস্তবতায় আপনার আঙুল যখন একটি ফুলকে স্পর্শ করে, তখন আপনার মনে হয় এটি একটি পদার্থ। কিন্তু কোয়ান্টাম বাস্তবতা হচ্ছে একগুচ্ছ শক্তি ও তথ্য (আপনার হাত) আরেক গুচ্ছ শক্তি ও তথ্যকে (ফুল) স্পর্শ করেছে। কারণ প্রতিটি বস্তুই কোয়ান্টাম লেভেলে স্পন্দনের গুচ্ছ।

১২০

সৎ সঙ্গ সব সময় আপনার আত্মবিশ্বাসে সহায়ক। সৎ সঙ্গ এক আত্মিক বন্ধন যা আপনাকে সীমাহীন প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তি প্রদান করে। সৎ সঙ্গ সব সময়ই প্রেরণার উৎসে রূপান্তরিত হয়।

১২১

স্বাস্থ্যবান সুখী মানুষ কখনও অতীতে বা ভবিষ্যতে বসবাস করে না। সে সব সময়ই বর্তমানে বসবাস করে।

১২২

জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সুখী হওয়া, পরিতৃপ্ত হওয়া। আর আত্ম উপলব্ধির মাধ্যমেই তা হওয়া সম্ভব।

***